এপ্রিল ২০২৬ ▪ চৈত্র ১৪৩২-বৈশাখ ১৪৩৩

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

সংস্কৃতি মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী ১৪ই এপ্রিল ২০২৬ ঢাকায় 'বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩' উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ আয়োজিত বৈশাখি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন– পিআইডি

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

এপ্রিল ২০২৬ ❑ চৈত্র ১৪৩২-বৈশাখ ১৪৩৩

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৫ই এপ্রিল ২০২৬ ঢাকায় সংসদ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষ থেকে Asia Zero Emission Community Plus সম্মেলনে অনলাইনে যোগ দেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীসহ সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধি এতে অংশ নেয়– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মো. ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
৮৩০০৬৮৭
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

নববর্ষ বাঙালির প্রাণের, ঐতিহ্যের, চিরায়ত সংস্কৃতির সর্বজনীন উৎসব। এদিন নতুন বঙ্গাব্দকে উৎসবে, মেলায়, শোভাযাত্রায় নানা আয়োজনের মধ্যে আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করা হয়। নতুনকে বরণ, পুরাতনকে পেছনে ফেলে নব উদ্যমে আগামীকে আবাহন করার সুর নিয়ে আসে বৈশাখ। বৈশাখ শুধু ঋতুচক্রের ধারাবাহিকতা নয় বরং ঐতিহ্য-চেতনারই নাম। বাংলা সন গণনার সঙ্গে যেমন ফসল ও মৃত্তিকার ভাবনা জড়িত, তেমনি বাংলা নববর্ষ উৎসবও জন-উৎসবের প্রতীক। শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বাংলা নববর্ষের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। পহেলা বৈশাখের নানা উৎসব মানুষের মাঝে মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে। অতীতের গ্লানি ও বিভেদ ভুলে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঐক্য ও সংহতি আরো সুদৃঢ় করে। এবারের নববর্ষ বয়ে আনুক অফুরন্ত আনন্দের বার্তা। স্বাগত ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ। সকলের প্রতি রইল নববর্ষের শুভেচ্ছা। এবারের সংখ্যায় নববর্ষ উপলক্ষ্যে রয়েছে একাধিক নিবন্ধ ও কবিতা।

২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। অটিস্টিক বা মানসিক বিকাশসংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুর প্রতি আমাদের সংবেদনশীল আচরণ, ইতিবাচক যত্ন ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিই পারে এমন শিশুদের কর্মক্ষম, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল রাখতে। পরিবার, স্কুল, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহায়ক পরিবেশ তাদের মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখে। তারাও হতে পারে বিখ্যাত। তারাও সম্ভাবনাময়– এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। এই দিনটি শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস, সংগ্রাম, সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতীক। এ দিবস উপলক্ষ্যে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। এ দিবস উপলক্ষ্যে নিবন্ধ রয়েছে। 'বাতিঘরের কুতুবদিয়া' শীর্ষক ভ্রমণকাহিনিটিও *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এপ্রিল ২০২৬ সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া থাকছে গল্প, কবিতা ও বিশেষ প্রতিবেদনসহ অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

নিবন্ধ/ভ্রমণ কাহিনি

বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে পহেলা বৈশাখ ৪
ড. মোহাম্মদ আলী খান

চৈত্র-বৈশাখের সন্ধিলগ্নে খনার বচন ৮
অরিজিৎ চৌধুরী

বাংলা নববর্ষ: সর্বজনীন বাঙালির উৎসব ১০
ড. আশরাফ পিন্টু

বাংলার লোক-উৎসব ১৩
ড. শিহাব শাহরিয়ার

মেধাস্বত্ব অধিকার: একটি অপরিহার্য অগ্রাধিকার ১৮
ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে

বাংলা সনের ইতিহাস ও বাংলা নববর্ষ ২১
ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য

চিংড়ি শিল্প উন্নয়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার: প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা ২৪
ড. মন্মথ নাথ সরকার

বাতিঘরের কুতুবদিয়া ২৮
ইয়াকুব আলী

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের সংস্কৃতির ফল্গুধারা ৩২
ড. সাইমন জাকারিয়া

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসের তাৎপর্য ও বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্র ৩৭
মো. মামুন অর রশিদ

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি ৪০
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

গুজব, সাইবার বুলিং ও সতর্কতা ৪৩
রেজা নওফল হায়দার

ধরিত্রী রক্ষা: দায়, দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪৬
ডা. নাজনীন নাওয়াল (বিপাশা)

অটিস্টিক শিশুরাও সম্ভাবনাময় ৪৯
এমরানা আহমেদ

জ্ঞান বিকাশে বই ৫২
মো. আরিয়ান হোসেন

গল্প

ফুল ভাসানোর উৎসব ৫৫
সুজন বড়ুয়া

রবিন বসনালয়
জসীম আল ফাহিম ৬১

কবিতা

৫৯-৬০
সাবরিন সুলতানা, শারমিন নাহার ঝর্ণা, আবুল কালাম তালুকদার, মামুন চাকলাদার, সিরাজুমমুনীর, এস এম তিতুমীর, মনির জামান, আলমগীর কবির

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা রহমান ৬৪

বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে পহেলা বৈশাখ

ড. মোহাম্মদ আলী খান

নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষের আবেদন সর্বজনীন। বাঙালি জীবনে এ এক অনন্য দিন। হালখাতা, পান্তাভাত, ইলিশ মাছ, শিশুর খেলনা বা রাজধানী ঢাকায় সাতসকালে রমনার বটমূলে ছায়ানটের শিল্পীকণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয় সেই অবিস্মরণীয় গান 'এসো হে বৈশাখ...' তখন সৃষ্টি হয় এক মুগ্ধতার আবেশ। শত শত বছর ধরে পহেলা বৈশাখে এদেশের মানুষ যেন ভেজামাটির গন্ধে আপ্লুত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্মারক ডাকটিকিটেও তার ছোঁয়া মেলে। তবে শুধু বাংলাদেশ নয়, আরো অনেক দেশেও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানমুগ্ধতা ছড়ায় স্ব স্ব জনজীবনে।

'আজ শুভ নববর্ষ', কথাটি বলেছিলাম আমার নেপালি বন্ধু বিষ্ণু অধিকারীকে। উচ্চশিক্ষার্থে কিছু সময়ের জন্য প্রবাসজীবন (নরওয়ে) কাটাতে হয়েছে এবং সে সুবাদে তাঁর সঙ্গে পরিচিতি। নেপালিদের সঙ্গে আমাদের অনেক মিল আছে, বিশেষ করে ভাষায়, উভয়েরই ভাষা সংস্কৃত দুহিতা। আমার শুভেচ্ছার উত্তরে বিষ্ণু অধিকারী পরিষ্কার তার নিজের ভাষায় বললেন, 'শুভ ১লা বৈশাখ'। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে জানাল, ১৪ই এপ্রিল তাঁরাও তাঁদের নববর্ষ পালন করেন অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে। মাসগুলোর নাম জানতে চাইলে বললেন– বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদুই, আশ্বিন, কার্তিক, মাংসির, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। নেপালে জন্মতারিখ সংরক্ষণ থেকে অফিস আদালতে সর্বত্র এই সন ব্যবহৃত হয়, তাঁরা বেতন পান এই মাস হিসেবে, খ্রিষ্টীয় মাস অনুসারে নয়। মাসগুলো বাংলা মাসের অনুরূপ, শুধু ভাদ্রকে বলে ভাদুই এবং অগ্রহায়ণের বদলে 'মাংসির'। এই ব্যতিক্রম ছাড়াও বড়ো ব্যবধান হলো সন গণনায়। যেমন– ১৪ই এপ্রিল ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে ১৪০৭ বঙ্গাব্দের শুরু আর নেপালি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী তা ২০৫৭ অব্দ। আমরা বাংলা সন বলি আর নেপালে তা বিক্রমসম্বাৎ নামে পরিচিত। এই বিক্রমসম্বাৎ মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য 'মেঘদূত' বর্ণিত উজ্জয়নী-রাজ বিক্রমাদিত্যের স্মৃতিসূচক।

১লা বৈশাখে কাঠমাণ্ডুতে আয়োজন

নেপালি বর্ষপঞ্জি

১লা বৈশাখে শ্রীলংকায় শৈল্পিক উপস্থাপনা

মনীষী আলবেরুণীর লেখায়ও (১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ) এই সনের উল্লেখ আছে। যদি মাস তারিখ একই হয় তাহলে সন গণনায় এত পার্থক্য কেন বাংলাদেশ ও নেপালে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে জনাব মুহম্মদ আবু তালিবের বিখ্যাত গ্রন্থ বাংলা সনের জন্মকথার সহায়তা নেওয়া যায়। তাঁর মতে, বাংলা সনের জন্ম হয় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (৯৯২ হিজরি-১৫৮৪ খ্রি.), প্রচলিত হিজরি সনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে রাজজ্যোতিষী মহাপণ্ডিত আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী এই সনের উদ্ভাবন করে। হিজরি চান্দ্র সন হলেও এটি সৌরসন। তাই হিজরি সনের সঙ্গে মিল থাকলেও বাংলা সনের সঙ্গে বছরের ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু জনাব মুহম্মদ আবু তালিব-এর একথা ঠিক নয় ‘বিক্রমসম্বাৎ ও নেপালি সনে অদ্যাবধি যথাক্রমে ‘কার্তিক’ ও ‘অগ্রহায়ণ’কে প্রথম মাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়’। কারণ, নেপালে শুধু আছে ‘বিক্রমসম্বাৎ’, কোনো আলাদা নেপালি সন নেই এবং বর্ষ শুরু বৈশাখ দিয়ে, অগ্রহায়ণ নামে কোনো মাসই নেই, কার্তিকের পরে এসেছে ‘মাংসির’। নেপালে সপ্তাহের দিনগুলোর নামও বাংলার মতো, শুধু রবিবারকে বলে আইতবার। আমরা যেমন চট করে বাংলা তারিখ বলতে পারি না, কারণ ব্যবহার কম, সরকারি চিঠি লেখার সময় বিজি প্রেসের বর্ষপঞ্জির দিকে তাকিয়ে বাংলা তারিখ ঠিক করে নেই। নেপালিরা সহজে বলতে পারেন, কারণ তারা বেতন পান এই মাস অনুযায়ী, খ্রিষ্টীয় মাস অনুসারে নয়। ১লা বৈশাখ নেপালেও সরকারি ছুটির দিন, এটি বছরের প্রথম ছুটির দিন। এদিন সারাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে মার্চপাস্ট অনুষ্ঠিত হয়।

তারিখ-এ-এলাহীর বারো মাসের নাম ছিল কারবাদিন, আর্দি, বিসুয়া, কোর্দাদ, তীর, আমার্দাদ, শাহরিয়ার, আবান, আজুর, বাহাম ও ইস্কান্দার মিজ। অনুমান করা হয়, বারোটি নক্ষত্রের নাম নিয়ে পরবর্তীকালে নামকরণ করা হয় বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ, জায়ীস্থা থেকে জ্যৈষ্ঠ, শার থেকে আষাঢ়, শ্রাবণী থেকে শ্রাবণ, ভদ্রপদ থেকে ভাদ্র, আশ্বায়িনী থেকে আশ্বিন, কার্তিকা থেকে কার্তিক, আগ্রায়হন থেকে অগ্রহায়ণ, পউস্যা থেকে পৌষ, ফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা নক্ষত্র থেকে চৈত্র।

নরওয়ে অধ্যয়নরত আমার সহপাঠী শ্রীলংকার হর্ষা সুরিয়ারচ্ছি জানালেন, তাঁরাও ১৪ই এপ্রিল নববর্ষ পালন করেন। এদিন তাঁদেরও সরকারি ছুটির দিন। মাসগুলোর নাম হলো দুরুথু, নাভাম, মাদিন, বাক, ওয়েশাক, পোসোন, আসালা, নিকিনি, বিনারা, ওয়াপ, ইল ও উনদুয়াপ। শুরুর মাস বাক (Bak)। শ্রীলংকার বেশির ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তাঁরা বর্ষগণনায় বৌদ্ধ বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করেন, যা ২০০০ সালে ২৫৫১ অব্দ এবং শকাব্দ অনুযায়ী ১৭৫১। সবই সৌরসন। বছরের প্রথম দিনকে, আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়ে

পাঞ্জাবে বৈশাখি উৎসবের আমেজ

এই দিনে মিয়ানমারের শিশুরা ও থাইল্যান্ডের উৎসবের নকশা

থাকে। পুরাতন বছরের শেষ এবং নতুন বছরের শুরুর সন্ধিক্ষণ, যা 'নোনাগাথা' নামে পরিচিত, দিনটির প্রধান আকর্ষণ। জ্যোতিষীরা আগে থেকে এই বিশেষ সময় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। দিনটিতে অনেকে মন্দিরে যান। বর্ষ শুরুতে যে উৎসব হয় তা 'বাক মাহা ইউলিলা' নামে সুপরিচিত।

উৎসবটির গুরুত্ব হলো, এক: ফসল কাটার শেষ, অন্য: নতুন বীজ রোপণের শুরু। বৌদ্ধ ও তামিল উভয়ই এ দিনটি পালন করে থাকে। নতুন বছর আলুথ আবুরুধা (Aluth Avurudda) নামে এবং পুরাতন বছর পারানা আবুরুধা (Parana Avurudda)

নানান দেশের স্মারক ডাকটিকিটে নববর্ষ

নামে পরিচিত। তবে নেপাল বা বাংলাদেশের মতো এই সন সারা বছর ধরে হিসাব করা হয় না, শুধু বর্ষপঞ্জির প্রথম দিনটি সাড়ম্বরভাবে পালিত হয়ে থাকে। সিংহলিদের কাছে সময়টা অনন্য, ফসল কাটা শেষ হয়েছে, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা বা রং করা হয়েছে। মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে দিবসটি। বিগত বছর ও নতুন বছরের মধ্যিখানে যুগসন্ধিক্ষণকে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা, উনুনে আগুন ধরানো, কাজ শুরু, চুলে তেল দেওয়া, প্রথম খাবার গ্রহণ, নতুন নামকরণ ইত্যাদি সবই এক বিশেষত্বের দাবি রাখে। গ্রামে কবিতা-গানের প্রতিযোগিতা হয়, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, মিষ্টি বিতরণ করা, ড্রাম বাজানোও দিনটির অপর আকর্ষণ। বর্ষগণনা ও মাসের নামে বাংলা সনের সঙ্গে মিল নেই, তবে মিল আছে বর্ষ শুরুর দিনটির সঙ্গে।

আর এক সহপাঠী উড়িষ্যার সত্যসিবা দাস জানালেন, উড়িষ্যায় ১৪ই এপ্রিল প্রদেশের সরকারি ছুটির দিন এবং নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানেও দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিনটি '১লা বৈশাখা'। মাসগুলি হলো– বৈশাখা, জ্যেষ্ঠো, আষাঢ়ো, শ্রাবণো, ভাদ্রো, আশ্বিনো, কার্তিকো, মাগ্রশিরো, পৌষো, মাঘো, ফাল্গুনা ও চৈত্র। নেপালিদের মতোই এখানেও অগ্রহায়ণ মাস নেই, সেখানে আছে মাগ্রশিরো। তাছাড়া বাকি মাসগুলো বাঙলা মাসের মতো, শেষের দিকে 'ও' কারের টান আছে, যেমন শ্রাবণকে বলে

'বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩' উপলক্ষ্যে ১৪ই এপ্রিল ২০২৬ ঢাকায় রমনা বটমূলে ছায়ানট আয়োজিত বর্ষবরণ– পিআইডি

শ্রাবণো। বর্ষ গণনায়ও অনেক ফারাক। বিক্রমসম্বাৎ অনুযায়ী ২০৫৭ সনটি নেপালিদের সঙ্গে মিলে। দিল্লিশ্বরেব্দা অনুযায়ী ১৪০৭ সন, যা বাংলা সনের অনুরূপ এবং তা প্রমাণ করে বাংলা সন সম্রাট আকবরের সময় চালু হয়েছিল। আর শকাব্দ অনুযায়ী ১৯২২ সন। উড়িষ্যার নিজস্ব বর্ষপঞ্জি মাদালাপাঞ্জি, সে অনুযায়ী ২০০০ সালে চলছে ৫১০৩ বছর। উড়িষ্যায় দিনটি সুপরিচিত 'মহাবিষুব সংক্রান্তি' নামে। সরকারি পর্যায়ে জাঁকজমকপূর্ণ কর্মসূচি না থাকলেও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি থাকে। মন্দিরে মন্দিরে কিছু উৎসব হয়, এর ভেতর প্রধান আকর্ষণ জগন্নাথ মন্দির (পুরী)। এখানকার নরেন্দ্র পুকুরে নৌকাভ্রমণ, চন্দনযাত্রা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতা পালিত হয়ে থাকে। কটকে হয় জমজমাট 'বিষুবা মিলনী'। অনেক বাড়িতেই এদিনে রোপিত হয় তুলসী গাছ, এজন্য তৈরি হয় মাচা, যা গাছকে দিবে ছায়া, মাচায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় পানিপাত্র এবং ছোটো ছিদ্রপথে একটু একটু পানি গড়িয়ে পড়ে তুলসী গাছের ওপর, যা গরম থেকে গাছকে রক্ষা করবে। Water-কে স্থানীয় উড়িয়া ভাষায় বলে পানি। নেপালিরাও বলে পানি। হিন্দিতে বলা হয় পানি। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় পানি ও জলকে ধর্মীয় বিভাজনে অভিসিক্ত করা হলেও হিন্দুপ্রধান নেপাল, উড়িষ্যা বা হিন্দি ভাষাভাষীদের কাছে এই বিভাজন লক্ষ করা যায় না। তাই নববর্ষে তুলসী গাছের জন্য 'পানিপাত্র' ঝুলানো শব্দগত পার্থক্যে অন্যরকম মনে হবে না। ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়াও কেরালা, তামিলানাড়ুতেও নববর্ষ পালিত হয় এই ১৩ই বা ১৪ই এপ্রিলে সেখানেও গণনা করা হয় সৌরসন, নতুন বছর পরিচিত পোংগাল নামে। যেমন– পাঞ্জাবে, সেখানে নতুন বছর পরিচিতি Vaisakhi, or Vasakhi নামে যা ফসলের উৎসব হিসেবে সমাদৃত, ১৬৯৯ সাল থেকে এ দিনটি শিখদের কাছে আসে ধর্মীয় আমেজ নিয়ে– আরো উদাহরণ আছে, এই দিনে বা মধ্য এপ্রিলে কম্বোডিয়ায় পালিত হয় Maha Songkran, থাইল্যান্ডে Songkran Festival, মিয়ানমারে Thingyan (water festival), বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহে বিঝু উৎসব। যেমন– নববর্ষে ঢাকার রমনা বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠান।

১লা বৈশাখ (১৩ই বা ১৪ই এপ্রিল) নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাংলাদেশ, নেপাল, ভারতের একাংশ, শ্রীলংকা, এমনকি কম্বোডিয়া, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে যে মিল তার ভিত্তি হলো বিক্রমসম্বাৎ। বাংলা সন এক্ষেত্রে স্বতন্ত্রের দাবিদার। কারণ সম্রাট আকবরের সময় হিজরিসনের ভিত্তিতে এবং সৌরসনের হিসাবে নতুন করে বাংলাসন চালু হয়, যা এ বছর (২০২৬) ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে আরো ব্যতিক্রম। এই কারণে যে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সারাদেশে যেভাবে জমজমাট নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয় তা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি আড়ম্বরপূর্ণ ও সর্বজনীন। মাসের নামের সঙ্গে শকাব্দ বা বিক্রমসম্বাৎ-এর মিল এবং সৌরসনের ভিত্তি এটাই প্রমাণ করে যে, চান্দ্র সনের ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও বাংলা সন আকৃতিতে রয়ে গেছে শকাব্দ শ্রেণির। নববর্ষ উদ্‌যাপনের শুরুটি (১লা বৈশাখ) একই দিন রয়েছে, যা মূলত সর্বজনগ্রাহ্য এক উৎসবের চিত্র তুলে ধরে। এ নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করলে নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে উঠবে।

তথ্যের উৎস: *রাতের সূর্যের দেশে* (ড. মোহাম্মদ আলী খান)/ আলবেরুণীর *ভারততত্ত্ব/ বাংলা সনের* জন্মকথা (মুহম্মদ আবু তালিব) / ইন্টারনেট/ উইকিপিডিয়া।

ড. মোহাম্মদ আলী খান: লেখক ও গবেষক, অবসরপ্রাপ্ত সচিব, khanma1234@gmail.com

চৈত্র-বৈশাখের সন্ধিলগ্নে খনার বচন

অরিজিৎ চৌধুরী

আরে বেটা চাষার পো
চৈত্রমাসে ভুট্টা রো।

চৈত্রের খরায় যখন মাটি ফেটে চৌচির, গাছের পাতা যখন ধুলো-ধূসর, ঠিক তখনই গ্রামবাংলার কোনো প্রবীণ কৃষকের মুখে ভেসে ওঠে পরিচিত সেই ছন্দ। কৃষকের সন্তানকে 'চাষার পো' বলে আপন করে ডেকে যথাসময়ে বীজ বোনার তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে ছন্দে। আজকের আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানও স্বীকার করে–

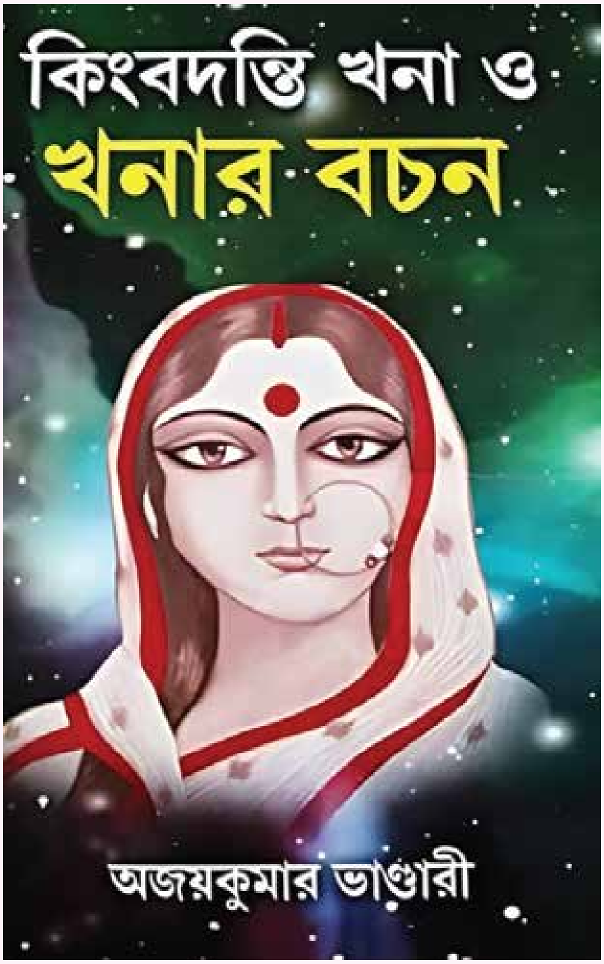

চৈত্রমাস (মার্চ-এপ্রিল) ভুট্টা রোপণের আদর্শ সময়। এভাবেই বাংলার কৃষকের মুখে মুখে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেঁচে আছেন 'খনা'।

বিস্মৃতির আড়ালে এক মহীয়সী

খনা আজ আমাদের কাছে অনেকটাই বিস্মৃত। তবে বাংলা ঋতু নিয়ে যখন ভাবতে বসি, বিশেষ করে চৈত্রের শেষদিন আর বৈশাখের প্রথমদিনের মতো ঋতু বদলের সন্ধিক্ষণে এসে তাঁর কথা মনে না পড়ে পারে না। কোন ঋতুতে কী করতে হবে, কোন আবহাওয়ায় আমাদের করণীয় কী? কৃষিকাজ, আবহাওয়া, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য– জীবনের প্রতিটি বাঁকে তিনি পথ দেখিয়েছেন তাঁর বচনের মধ্য দিয়ে।

খনার পরিচয় তাঁর নিজের বচনেই পাওয়া যায়– 'আমি অটনাচার্যের বেটি, গণা বাছায় করে না আটি।' আরেকটি বচনে তিনি বলেছেন– 'ভাষা বোল পাতে লেখি, বাচাহুব বোল পড়ি সাথি।' অর্থাৎ তিনি তাঁর জ্ঞান তালপাতা বা ভুর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন বলে ধারণা করা যাচ্ছে। যদিও এমন কোনো পাণ্ডুলিপি আজও নিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত হয়নি, যেখানে খনা তাঁর বচন লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তবু মুখে মুখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁর বচন টিকে আছে।

ঐতিহাসিকদের ধারণা, খনার বচনেরকাল ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের সমসাময়িক বা আরও প্রাচীন। সেই যুগে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম, আর খনার বচন ছিল সেই জ্ঞানচর্চারই এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এমনকি জনশ্রুতি আছে, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের দশম সদস্য হিসেবে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

চৈত্র-বৈশাখের সঙ্গী

চৈত্রসংক্রান্তি বাংলা সনের শেষদিন। 'সংক্রান্তি' শব্দটিই বলে দেয় এর অর্থ– শেষ ও শুরুর সন্ধিক্ষণ। আসলে একেবারে শেষ বা একেবারে শুরু বলে কিছু নেই; দুটি চক্রাকারে একে অপরের পেছনে ছুটছে। এই দর্শনেই চৈত্রসংক্রান্তি আমাদের সংস্কৃতিতে এত গভীরভাবে প্রোথিত।

এই দিনে কোনো কোনো অঞ্চলে আঠারো-রকম শাকসবজির নিরামিষ রান্না করা হয়। তবে সব অঞ্চলে ঘরদোর পরিষ্কার করে সংক্রান্তি ও নববর্ষের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। নিমের ডাল ও ফুলের মালা দরজায় টাঙানো, সকালে কাঁচাহলুদ মেখে স্নান– এসব আচার একেবারেই লোকজ, মাটিসংলগ্ন সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই খাদ্যাভাস ও আচারের মধ্যেও কিন্তু কৃষিজ কারণ লুকিয়ে আছে, যার ইঙ্গিত মেলে খনার বচনেই।

বৈশাখকে ঘিরে খনার বচনের কোনো অভাব নেই। তিনি বলেছেন– 'চৈত্রে দিয়া মাটি/ বৈশাখে কর পরিপাটি।' চৈত্রে মাটি তৈরি করলে বৈশাখে ফসল পরিপাটি হবে– এই সরল সত্য আজও অটুট। আরেকটি বচনে ঋতু পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট– ' চৈত্রেতে থর থর/বৈশাখেতে ঝড় পাথর/ জ্যৈষ্ঠতে তারা ফুটে/তবে জানবে বর্ষা বটে।' আর 'বৈশাখের প্রথম জলে/আশুধান দ্বিগুণ ফলে'– বৈশাখের প্রথম বৃষ্টিতে আশুধানের ফলন দ্বিগুণ হওয়ার এই পর্যবেক্ষণ কৃষকের কাছে আজও মূল্যবান।

জ্ঞানের ভাণ্ডার, ছন্দে বাঁধা

খনার বচন কেবল আবহাওয়ার পূর্বাভাস নয়– এ এক সম্পূর্ণ জীবনদর্শন। চাষাবাদ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধি পর্যন্ত সবকিছুই তিনি ছন্দের মধ্যে ধরে রেখেছেন।

চাষের কৌশলে তিনি বলেছেন– 'ষোল চাষে মূলা, তার অর্ধেক তুলা; তার অর্ধেক ধান, বিনাচাষে পান।' জমি তৈরির গুরুত্ব এর চেয়ে সহজ করে আর কে বলেছেন? মাটির গুণবিচারেও তাঁর দৃষ্টি অব্যর্থ– 'শুনরে বাপু চাষার বেটা, মাটির মধ্যে বেলে যেটা; তাতে যদি বুনিস পটল, তাতে তোর আশার ফল।' শ্রম ও সম্পদের সদ্ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন– 'বলদ থাকতে করে না চাষ, তার দুঃখ বারমাস।'

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণেও তিনি তুলনাহীন। একটি বহুল পরিচিত বচনে তিনি বলেছেন–

স্বর্গে দেখি কোদাল কোদাল
মধ্যে মধ্যে আইল।
ভাত খাইলা ও শ্বশুর মশায়
বৃষ্টি হইবে কাইল।

আকাশের মেঘের রূপ দেখে পরের দিনের বৃষ্টির পূর্বাভাস– এই পর্যবেক্ষণ শক্তি আজকের আবহাওয়াবিদদেরও চমকে দেওয়ার মতো। স্বাস্থ্য বিধিতেও তাঁর সমান মনোযোগ– 'আম নিম জামের ডালে/ দাঁত মাজও কুতূহলে।' আম, নিম ও জামের ডাল দিয়ে দাঁত মাজার যে উপকারিতা তিনি বলে গেছেন, আধুনিক দন্তচিকিৎসকরা তা আজও স্বীকার করে।

পশুসম্পদ ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনাচার– খনার বচনে বিষয়ের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এই বচনগুলো ছন্দে রচিত হওয়ায় মুখে মুখে মনে রাখা সহজ, আর সেটাই ছিল প্রজন্মান্তরে জ্ঞান হস্তান্তরের কৌশল।

হাজার বছর পরেও প্রাসঙ্গিক

চৈত্রের শেষদিনে যখন পুরানো বছরকে বিদায় দেই, বৈশাখের প্রথমদিনে যখন নতুন বছরকে বরণ করি, তখন খনার বচন শুধু লোকজ ঐতিহ্যের উদ্ধৃতি নয়, এ যেন হাজার বছরের অভিজ্ঞতার পরম্পরা। গ্রামবাংলার মেলায়, প্রবীণ কৃষকের মুখে, মায়ের শেখানো ছন্দে– এই বচনগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জ্ঞান হস্তান্তরের সেতু হয়ে আছে।

আজকের কৃষিবিজ্ঞান মাটি পরীক্ষা করে বীজ বোনার পরামর্শ দেয়। বহু শতাব্দী আগে খনা সেই একই কথা বলেছিলেন ছন্দে ছন্দে। তাই এই মহীয়সীর বচনগুলোকে শুধু স্মৃতিমেদুরতায় নয়– আধুনিক কৃষিগবেষণার আলোয় পুনরায় পাঠ করার সময় এসেছে। চৈত্র-বৈশাখের এই সন্ধিলগ্নে তাঁর বাণী আমাদের মনে

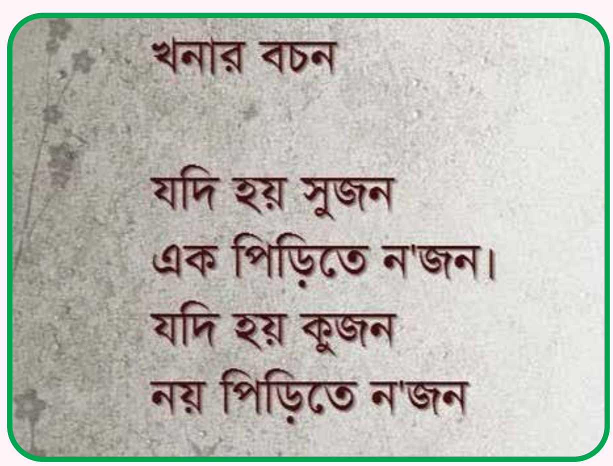

করিয়ে দেয়– যে জ্ঞান হাজার বছর ধরে টিকে থাকে, সেটাই আসল সম্পদ।

অরিজিৎ চৌধুরী: সাবেক অতিরিক্ত সচিব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন ১৪ই এপ্রিল ২০২৬ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

বাংলা নববর্ষঃ সর্বজনীন বাঙালির উৎসব

ড. আশরাফ পিন্টু

উৎসবের আদি ইতিহাস অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়– 'উৎসব' হলো বৈদিক ঋষিদের 'সোমরস' নিষ্কাশনের এক আনন্দ-উদ্বেল লোকাচার। 'সোমরস' বৈদিক সোম যজ্ঞানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। কালক্রমে এ উৎসব শব্দের অর্থ বদলে গেছে। এখন উৎসব বলতে ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় আনন্দানুষ্ঠানকেই বুঝায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উৎসব রয়েছে। এগুলোকে ধর্মীয়, সামাজিক ও জাতীয় বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়। ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের দুই ঈদ, হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা, চৈত্রসংক্রান্তি, খ্রিষ্টানদের বড়দিন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বুদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান তিনটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে যাদের প্রত্যেকেরই বছরের নতুন দিনে উৎসব আছে। ত্রিপুরাদের বৈশুখ, মারমাদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। বর্তমানে

তিনটি জাতিসত্তা একত্রে এই উৎসবটি পালন করে। যৌথ এই উৎসবের নাম বৈসাবি উৎসব। যা ওরা বাংলা নববর্ষের দিনেই পালন করে থাকে। জাতীয় উৎসবের মধ্যে আছে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন। আর সামাজিক বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা নববর্ষের উৎসব। এ উৎসব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও এ উৎসব পালন করে থাকে।

মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে থেকেই ভারতবর্ষে নববর্ষ পালিত হতো। তখন সৌর বছরের প্রথম দিন আসাম, বঙ্গ, কেরল, মনিপুর, নেপাল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পালিত হতো। এখন যেমন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে পালিত একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, এক সময় এমনটি ছিল না। তখন নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আর্তব উৎসব তথা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হতো। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ, কারণ প্রাযুক্তিক প্রয়োগের যুগ শুরু না হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের ঋতুর ওপরই নির্ভর করতে হতো। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করতেন। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সঙ্গে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হতো। খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্রাট আকবর বাংলা সালের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার

খুলনাবাসীর বর্ষবরণ

করার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী সৌর সাল এবং আরবি সালের ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সাল চালু করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০/১১ই মার্চ থেকে বাংলা সাল গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬ খ্রি.) থেকে। প্রথমে এই সালের নাম ছিল ফসলি সাল, পরে 'বঙ্গাব্দ' বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়।

মূলত সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেককে বাংলা চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকত। এর পর দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় যার রূপ পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে এই পর্যায়ে এসেছে। তখনকার সময় এই দিনের প্রধান ঘটনা ছিল একটি হালখাতা তৈরি করা। হালখাতা মানে পুরাতন বইয়ের হিসেবের পাঠ চুকিয়ে নতুন হিসাব বই খোলা। প্রকৃতপক্ষে হালখাতা হলো বাংলা সনের প্রথম দিনে দোকানপাটের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। বর্তমানে গ্রাম, শহর বা বাণিজ্যিক এলাকা, সকল স্থানেই পুরানো বছরের হিসাব বই বন্ধ করে নতুন হিসাব বই খোলা হয়। হালখাতার দিনে দোকানদাররা তাদের ক্রেতাদের মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে। এই প্রথাটি এখনও অনেকাংশে প্রচলিত আছে।

আধুনিক নববর্ষ উদ্‌যাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর পহেলা বৈশাখে হোম কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দেও অনুরূপ কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সনের পূর্বে ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালনের রীতি তেমন একটা জনপ্রিয় হয়নি।

নববর্ষে উৎসব গ্রামীণ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নববর্ষের দিন গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণাঢ্য মেলা বসে। মেলায় বিভিন্ন লোকজ খাবার– খই, মুড়ি, বাতাসা এবং লোকজ খেলনা– যেমন মাটির তৈরি পুতুল, আম, কাঁঠাল, বাঁশের বাঁশি ইত্যাদি কেনাবেচায় সাধারণ মানুষ মুখর হয়ে ওঠে। এছাড়া নাগরদোলা, পুতুলনাচ ইত্যাদি আনন্দ-অনুষ্ঠানে নববর্ষের এ দিনটিতে ছোটো-বড়ো সবাই আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এই দিনেই শুরু হয় ব্যবসায়ীদের ঐতিহ্যবাহী শুভ হালখাতা। প্রতিটি বিক্রয় প্রতিষ্ঠানেই ক্রেতাদের মিষ্টান্ন সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। মূলত নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখি মেলা। স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, বিভিন্ন লোকশিল্পজাত পণ্য, মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী এই মেলায় পাওয়া যায়। এ মেলায় বিনোদনের জন্য বাউল শিল্পী বা বয়াতিদের উপস্থিতি থাকে।

তারা পালাগান, জারিগান, কবিগান, মুর্শিদি গানসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক গান পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে থাকে। এর ফলে এই মেলা বাঙালিদের কাছে সর্বজনীন মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বর্তমানে নাগরিক জীবনেও লোক ও নগর-সংস্কৃতির মিশ্রণে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে নববর্ষের উৎসব পালিত হয়ে থাকে। শহরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নববর্ষের উৎসব। এ সময় নতুন সূর্যকে প্রত্যক্ষ করতে উদ্যানের কোনো বটমূলে নববর্ষকে স্বাগত জানাতে শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। এ দিন সকল বয়সের পুরুষেরা বাঙালি পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি, নারীরা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি, হাতে চুড়ি, খোঁপায় ফুল, গলায় ফুলের মালা এবং কপালে টিপ পরে। বর্তমানে ইলিশের দুর্মূল্য হলেও শহরে সকলে একসঙ্গে বসে পান্তা-ইলিশ খাওয়া একটা বিশেষ ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

নববর্ষের উৎসব সর্বজনীন হলেও বর্তমানে উৎসবের গায়ে যুগ পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট। উৎসব যেখানে অনাবিল হৃদয় আবেগের প্রাধান্য ছিল, ছিল প্রীতিময়তা, সেখানে কৃত্রিমতা তাকে গ্রাস করেছে। হৃদয়হীন আচার-অনুষ্ঠান আর চোখ-ঝলসানো চাকচিক্য আজ উৎসবের বৈশিষ্ট্য। নগর সভ্যতার যান্ত্রিকতায় আজ আমাদের হৃদয়-ঐশ্বর্য লুণ্ঠিত। তাই উৎসবের মহতী কল্যাণী রূপটি কালো পর্দায় আচ্ছন্ন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী। কিন্তু উৎসবের দিন মানুষ বৃহৎ, সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া বৃহৎ ...।' আমরা যেন এই বৃহৎ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে চিরায়ত লোক-সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করে সর্বজনীন নববর্ষ উৎসব পালন করতে পারি – এটাই কাম্য।

ড. আশরাফ পিন্টু: কবি, প্রাবন্ধিক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বেড়া, পাবনা
ashrafpintu.sonon@gmail.com

বাংলার লোক-উৎসব

ড. শিহাব শাহরিয়ার

যে উৎস থেকে বা যার মাধ্যমে আনন্দের প্রকাশ ঘটে, তাকেই উৎসব বলা যেতে পারে। এক কথায় উৎসব হলো আনন্দানুষ্ঠান। উৎসবের উৎস হতে পারে পরিবার, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি। আবার সময় ও সমাজ পরিবর্তনের কারণে কোনো কোনো উৎসব বিলুপ্ত হয়ে যায়, কোনো উৎসব রূপ বদলায়, কোনো কোনো উৎসব বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় হয়। কোনো কোনো উৎসব সর্বজনীন, আবার কোনো কোনো উৎসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের। যেমন– নববর্ষের উৎসব সর্বজনীন আর ঈদ, দুর্গাপূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা কিংবা বড়দিনের উৎসব হলো ধর্মীয় উৎসব। অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশে সব ধরনের উৎসবই পালিত হয়। তবে বাংলার লোক-উৎসবের চরিত্র অসম্প্রদায়িক, বৈচিত্র্যময় ও প্রাণময়। সে অর্থে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রিয় আনন্দ আয়োজন হলো 'লোক-উৎসব'।

লোক-উৎসবের মাধ্যমে এদেশের সহজসরল জনগণ তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে সামান্য আনন্দ আহরণ করে। বছরের কয়েকটি দিন তারা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আনন্দে মেতে ওঠে। উৎসবে থাকে খাওয়াদাওয়া, গানবাজনা ও মুখর পরিবেশ। উৎসবের দিন ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ সবাই আন্তরিক হয়ে যায়, দুঃখবেদনা আড়াল করে আত্মলীন হয় আনন্দ-আমেজে। কারণ বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। শত-সহস্র বছর পরাধীনতার কারণে বাঙালি উৎসবের আনন্দে থেকে অনেকটা বঞ্চিত ছিল। তবে নদীমেখলা এই বাংলায় নীরবে-নিভৃতে হলেও উৎসবের আয়োজন ছিলই। বর্তমান স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে উৎসব পালিত হচ্ছে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে। বিশেষ করে লোক-উৎসবকে ঘিরে আনন্দের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। যেমন, বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ উৎসব। এটি এখন বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ লোক-উৎসব। আরো অর্জন ও খুশির খবর হলো ঢাকায় নববর্ষের আয়োজনে যে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, তা অতি সম্প্রতি ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এই প্রাপ্তিতে বাঙালির লোক-সংস্কৃতি ও লোক-উৎসব নতুন মাত্রা পেল।

অনুসন্ধান করি লোক-উৎসবের সূচনা কীভাবে হলো? অর্থাৎ উৎসবের শুরু কখন? গবেষকরা মনে করেন, অতি প্রাচীনকালে; যখন আদিম শিকারি মানুষরা একসঙ্গে বসে খাওয়া শুরু করল, তখন থেকেই। শিকারের মাংস পোড়ানোর পর তা একত্রে বসে খাওয়ার বা ভোজ করার পর্বটিই ছিল উৎসবের সূচনা। শিকারি মানুষরা শিকার করত আর তা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেতো; যা বর্তমান আধুনিক সভ্যতার চরমে নাম হয়েছে বারবিকিউ। প্রকৃত অর্থে উৎসবের শুরু আরো পরবর্তী পর্যায়ে, যখন মানুষ শিকার জীবন থেকে কৃষি ও পশুপালন জীবনে প্রবেশ করল। মূলত কৃষিই হলো মানব সভ্যতার উষাকাল। কারণ আদিম শিকারি সময়টা ছিল মানুষের ভয়ের কাল, তখন তারা প্রকৃতির নানামুখী আচরণে ভয় এবং সূর্যদেবের তুষ্ট করার প্রত্যয় থেকে ধর্ম-বিশ্বাসে আগ্রহী হয়ে উঠল। শুরু করল পূজা অর্চনা, দেব-দেবীর প্রার্থনা যা এক অর্থে উৎসবেরই নামান্তর। বর্তমানে এসব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মূলত কৃষি সমাজে এসে মানুষের এক ধরনের প্রাপ্তি, প্রাপ্তির আনন্দ সরাসরি বললে, ফসল উঠানো এবং সেই ফসল থেকে নানারকম খাবার তৈরি ও তা পরিবার বা

আত্মীয়স্বজন মিলে খাবার মধ্য দিয়েই উৎসবের আনন্দময় যাত্রা শুরু হলো। কৃষকরা বছরের নির্দিষ্ট কোনো কোনো দিনে, যেমন ধান কাটা শেষ হলে, সেই ধান থেকে নানা ধরনের খাবার তৈরি করে সকলে মিলে খাওয়া, গানবাজনা করা, আনন্দ-ফুর্তি করত। যেমন নবান্ন উৎসবের কথা। নবান্ন হলো ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব। নতুন অন্ন মানে নবান্ন। অর্থাৎ আমন ধান কাটা শেষ হলে, সেই ধানের চাল দিয়ে যে প্রথম ভাত রান্না হয় এবং পরিবেশন করা হয় ও সে আয়োজিত অনুষ্ঠান বা জমায়েতই হলো নবান্ন উৎসব। বাংলা অগ্রহায়ণ মাসেই এই নবান্ন উৎসব হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এই নবান্ন উৎসব ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব।

বাংলার লোক-উৎসবের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। কারণ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আবহমানকাল থেকে কৃষকরা নানা সময়ে নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন করে আসছে। আর এইসব লোক-উৎসব জড়িয়ে আছে ফসল কাটার সঙ্গে। বলা হয়, বাংলাদেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ। যদি তেরো পার্বণও হয় এইসব পার্বণের সাথে কৃষি এবং কৃষক অর্থাৎ সমাজের সাধারণ মানুষ জড়িত। লোক-উৎসবের সঙ্গে ধর্মীয় আচার-আচরণ, এমনকি বর্তমানে উৎসবের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে অর্থনীতি।

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ। বাংলা নববর্ষ এখন জাতীয় উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। গ্রাম ছাপিয়ে এই উৎসব বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বিপুলভাবে পালিত হচ্ছে। সংগীত প্রতিষ্ঠান ছায়ানট সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষবরণের গান দিয়ে শুরু করে এবং চারুকলা অনুষদ শোভাযাত্রায় ভরিয়ে তোলে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাহবাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। এর সাথে বসে মেলা, মেলায় থাকে নানারকমের খাবার-দাবার, বিভিন্ন লোক খেলাসহ নানা আয়োজনে মুখরিত হয়ে ওঠে দিনটি। অসাম্প্রদায়িক বাঙালির প্রাণে প্রাণে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। বাংলা ষড়ঋতুর প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। বলা হয় সম্রাট আকবরের আমল থেকে বৈশাখের প্রথম দিন অর্থাৎ নববর্ষ পালনের প্রচলন হয়েছে। এই দিন হালখাতা উৎসবও পালন করা হয়। ব্যবসায়ীরা বছরের এই দিনে বিগত বছরের বাকি টাকা উঠাতে লাল বাঁধাই করা বিশেষ মলাটের নতুন খাতা খোলেন এবং মিষ্টি রাখেন আর ক্রেতারা তাদের বাকি টাকা পরিশোধ করে মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরেন। লোকগবেষকরা জানান, প্রাচীন কাল থেকে এ উপলক্ষ্যে গ্রামবাংলার কৃষক পরিবারে চৈত্রসংক্রান্তির রাতে গৃহিণীরা 'আমানি' প্রস্তুত করে। একটি বড়ো হাঁড়িতে অনেকটা পানির মধ্যে আম আর কিছু চাল ভেজানো হয়। আর ওই হাঁড়ির ভেতর রাখা হয় একটি সপত্র আমের ডাল। ভোরবেলা বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে গৃহিণী তাদের ঐ ভেজানো চাল খেতে দেয়, আর আমের ডাল দিয়ে গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। এতে শরীর ঠান্ডা থাকে বলে তাদের বিশ্বাস। এদিন সবাই সাধ্যমতো উন্নত ভোজের আয়োজন করে। এর মূলে তাদের এই বিশ্বাস কাজ করে যে, বছরের প্রথম দিন ভালো ভোজ হলে সারা বছরই ভালো ভোজ হবে। এ উৎসবকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন শহরে, নগরে ও গ্রামাঞ্চলে মেলা বসে।

বৈশাখের পর আষাঢ় মাসে আরেকটি লোক-উৎসব বাঙালিরা পালন করে, সেটি হলো 'অম্বুবাচী'। এটি মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ লোক-উৎসব। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিনদিন এটি পালিত হয়। এসময় হিন্দু নারীরা নানা ধরনের ক্রিয়াচার পালন করে। তাদের বিশ্বাস, এ তিনদিন আকাশ ও পৃথিবীর মিলন হয় এবং এতে ধরিত্রী সিক্ত হয়ে কৃষিকাজের উপযোগী হয়। এসময় মাটি খোঁড়া, হাল চালনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। হিন্দু বিধবা নারীরা এসময় কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলে। এ উপলক্ষ্যে পিঠা-পুলি ইত্যাদি বিশেষ ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয়।

বাংলার কৃষকদের বৃষ্টি আহ্বান আরেকটি কৃষিসংক্রান্ত লোক-উৎসব। প্রচণ্ড খরায় যখন বাংলা মাঠ-ঘাট চৌচির এবং কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সমাজে বিপর্যয় দেখা দেয়, গবেষকরা মনে করেন, এই থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নানা ধরনের ক্রিয়াচার

পালন করা হয়। সেসবের মধ্যে ব্যাঙবিয়ে, বদনাবিয়ে, মঘারানী, হুদমাদেও সম্পর্কিত বৃষ্টিআবাহন অনুষ্ঠান এবং পুণ্যিপুকুর ব্রত ও বসুধারা ব্রত উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী মেয়েরা বৃষ্টি কামনায় রাতে দলবেঁধে দেমাদেও-এর গান গায়। প্রাচীনকালে আজটেকদের মধ্যে বৃষ্টিদেবতাকে তুষ্ট করার জন্য একটি সুন্দরী কুমারী মেয়েকে নানা অর্ঘ্যসহ উৎসর্গ করার প্রথা ছিল। বিশেষ করে বৃষ্টির আহ্বানে গ্রামে গ্রামে নেমে যায় ছেলেমেয়ে আর যুবক-যুবতীরা। কখনো কখনো ছড়া কাটে 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দিবো মেপে'। বিশেষ করে নারীরা কুলা সাজিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়, গানবাজনা করে গ্রামে গ্রামে ঘোরে, মাটিতে জল ঢেলে সেই কাদামাটি দিয়ে একজন আরেকজনকে মাখিয়ে দেয় এবং বৃষ্টি আহ্বান করে। এই বৃষ্টি আহ্বান উৎসবকে বলা হয় 'কুলা-নামানো'।

হাওর ও নদী অঞ্চলের একটি অন্যতম উৎসব হলো 'বেরাভাসান' উৎসব। জলের সব রকমের অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ উৎসবের আয়োজন করা। গবেষকরা জানিয়েছেন, ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার খোয়াজ-খিজিরের (জলের দেবতা বরুণের স্থলাভিষিক্ত) উদ্দেশে উৎসবটি নিবেদিত হয়। সামাজিক, পারিবারিক বা ফকির সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। মুঘল আমলে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল ও ঢাকায় নবাব-নায়েবে নাজিমদের উদ্যোগে মহাসমারোহে এ উৎসব পালিত হতো। এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুকাররম খান, নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং মীর কাসিম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। এই লৌকিক উৎসবটি তখন তাঁদের কল্যাণে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল।

বাংলার ভাদ্র মাসে আরও একটি উৎসব হয়। বর্ষা সময়ের এই উৎসবটি পালন করে এদেশের ওরাও নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা। এটি ভাদ্র-সংক্রান্তির 'কারাম' উৎসব নামে খ্যাত। গবেষকরা বলেছেন, কারাম এক ধরনের গাছ। এর পূজা উপলক্ষ্যেই এ উৎসব করা হয়। উত্তরাঞ্চলে একে ভাদইপর্ব, বর্ষাপর্ব ইত্যাদিও বলা হয়। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে ওরাওঁ সমাজের কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীরা হয়ে ওঠে নৃত্যচঞ্চল, সংগীতমুখর এবং পানাহারমত্ত। এ পর্ব কেবল কারাম বৃক্ষের আবাহন নয়, প্রকৃতপক্ষে ওরাওঁ তরুণ-তরুণীদের মন দেওয়া-নেওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা প্রকাশেরও উৎসব। ভাদ্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলেও তার প্রস্তুতি চলে পূর্বরাত্রির শেষ প্রহর থেকে তরুণ-তরুণীরা একে পূত-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে তখন থেকেই উপবাস শুরু করে এবং কারাম বৃক্ষের পূজার মাধ্যমে তারা স্রষ্টার প্রতি নিজেদের ভক্তি নিবেদন করে।

সাদা মেঘের ভেলা যখন আকাশে আর সাদা কাশফুল যখন বাংলার শুকনো নদীর তীরে তীরে মন মাতিয়ে তোলে, তখন শরৎকাল বাংলাদেশে; এই শরৎকালে শরৎ-উৎসব এখন পালন হচ্ছে কোথাও কোথাও, কিন্তু আগে শরৎ ঋতুরই শেষ মাস আশ্বিনের শেষ রাত থেকে শুরু হয়ে পরের দিন পহেলা কার্তিক প্রত্যুষ পর্যন্ত একটি অনুষ্ঠান হতো এর নাম 'গাস্বি' উৎসব, যাকে হৈমন্তিক ধানের শীষে দুধ সঞ্চয়মূলক উৎসবও বলা হতো। এই উৎসবের বিষয় ছিল- ফসল যাতে ভালো হয়, সেজন্য পহেলা কার্তিক ভোরে কাঁচা হলুদ ও শুন্দি একত্রে বেটে সরিষার তেলসহ ধানগাছে মাখিয়ে দেওয়া হয়। গবেষকদের মতে, এছাড়া অফলা গাছে ফল ফলানোর উদ্দেশ্যে গাছের ডালে শামুকের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া বা গাছটি কেটে ফেলার অভিনয়ও করা হয়। এসময় মশা-মাছি ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব রোধ করার জন্য পূর্ব রাতে প্যাকাটি জ্বালিয়ে ছেলেরা ছড়া কাটে। নীরোগ স্বাস্থ্যের জন্য লোকেরা এ রাতে তেলাকুচার পাতা, আমগুরুজের লতা, হলদি, পান ইত্যাদি বেটে গায়ে মেখে স্নান করে। এ অনুষ্ঠানে তারা আশ্বিনের শেষদিন

রান্না করে এবং পরের দিন খায়। তাই জনশ্রুতি আছে, 'আশ্বিনে রান্ধে-বাড়ে, কার্তিকে খায়/ যে যেই বর মাগে সেই বর পায়'। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে অবশ্য এ উৎসবের প্রচলন নেই।

সাধক লালন সাঁই, যার স্মরণে প্রতিবছর পয়লা কার্তিক কুষ্টিয়া জেলার ছেউড়িয়ায় পালিত হয় লালনোৎসব। লালন অনুসারী ফকির ছাড়া অন্যান্য লোকধর্মের সাধকরাও এতে যোগদান করে। এ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। এতে লালনের অনুসারী এবং লোকসংগীতশিল্পীরা লালনগীতি পরিবেশন করেন। কোনো কোনো লোকক্রীড়াও লোকউৎসবের রূপ নেয়, যেমন নৌকাবাইচ, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদি। এ উপলক্ষ্যে যে জনসমাগম হয় তাকে রীতিমতো লোক-উৎসব বলা যায়। নৌকাবাইচের সময় নদীর দুই তীরে সারিবদ্ধ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কোন নৌকা প্রথম হয় তা দেখার জন্য। নৌকাবাইচ আজও একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক খেলা হিসেবে প্রচলিত আছে। ষাঁড়ের লড়াইও কম উত্তেজনাকর খেলা নয়।

নবান্ন উৎসবের কথা আগেও বলেছি। বাংলা অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল ওঠার পর এ উৎসবটি এক সময় হিন্দুদের মধ্যে ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো। কারণ মুসলিম শাসকদের বাংলা বিজয়ের আগে হিন্দু কৃষকরাই এ অঞ্চলে জীবনযাপন করত। তারা উৎসবের দিন ভোর না হতেই বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা ঘরের বাইরে এসে ছড়া কেটে দাঁড়কাকদের নেমন্তন্ন করতো: 'কো কো কো, আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন/ শুভ নবান্ন খাবা কাকবলি লবা/ পাতি কাউয়া লাথি খায়/ দাঁড় কাউয়া কলা খায়/ কো কো কো, মোরগো বাড়ি শুভ নবান্ন'। এদিন নতুন চাল ঢেঁকিতে কোটা হয়। বেলা দশটার দিকে বাড়ির প্রবীণগণ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং ছেলেমেয়েরা নতুন জামা-কাপড় পরে। মুসলিম পরিবারেও নবান্নের প্রচলন ছিল। সংস্কারবশত তারাও লক্ষ্মীর শিরনি দিত। একে তারা বলত 'নাওয়া-খাওয়া'। উৎসবের আমেজ এদের মধ্যে থাকলেও হিন্দুদের মতো এত আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। প্রথম অঘ্রানে নবান্ন উৎসব এখন ঢাকাতেও পালিত হচ্ছে ঘটা করে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় আলোচনা, গানবাজনা আর নানা রঙের পোশাকে নবান্ন উৎসব পালনে মেতে ওঠে। বর্তমানে এই উৎসবটি একটি সর্বজনীন উৎসব হিসেবে বাঙালিরা পালন করছে।

বাংলাদেশের একটি শস্য উৎসবের নাম পৌষ-উৎসব বা পৌষপার্বণ বা পোষলা। পৌষ মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লোক গবেষকদের মতে, এ উপলক্ষ্যে মুসলিম রাখাল ছেলেরা মানিক পীরের গান গেয়ে, আর হিন্দু রাখালেরা লক্ষ্মীর নামে ছড়া কেটে সারা পৌষ মাস সন্ধ্যার পর বাড়ি বাড়ি মাগন করত। মাগনশেষে তারা পৌষসংক্রান্তির সকালে মাঠ বা বনের ধারে রান্না করে পিঠা বা শিরনি বানিয়ে পীর বা দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করত এবং পরে নিজেরা খেত। একে পিঠাপর্বও বলা হতো। বর্তমানে পৌষপার্বণ উৎসবটি গ্রামবাংলার পরিবর্তে জেলা শহরগুলোতে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে পালিত হয়।

কবি সুভাস মুখোপাধ্যায়ের উচ্চারণ: 'ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত', এই উচ্চারণকে সামনে রেখে বাঙালিরা পালন করছে বসন্ত উৎসব বা পহেলা ফাল্গুন উৎসব। বর্তমানে এটিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হচ্ছে। এসময় শিমুল, পলাশ, মান্দার আর কৃষ্ণচূড়ার মন মাতানো লাল ফুলের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে সবুজ বাংলাদেশ।

বাংলা ঋতুর শেষ মাসের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় চৈত্রসংক্রান্তি অনুষ্ঠান বা উৎসব। এটি এখন ঢাকাতেও প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রসিক ও কোনো কোনো বড়োলোক বাঙালির বাড়ির আঙ্গিনা বা

ছাদের ক্ষুদ্র পরিবেশেও শেষ চৈত্রের সন্ধ্যায় এই উৎসব উপলক্ষ্যে নানারকমের খাবারদাবার ও গানবাজনার আয়োজন হয়। এই দিন সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা তিন দিনের চড়কপূজা উৎসব করে। এটি তাদের গুরুত্বপূর্ণ লোকোৎসব। চৈত্রের শেষ এবং বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিনব্যাপী এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে দুতিন দিনব্যাপী মেলা বসে। এই তিন দিন পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকমারা আয়োজন করে বিজু ও মারমারা আয়োজন করে সাংগ্রাই উৎসব। এটি বিগত বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য তাদের অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও আনন্দঘন লোক-উৎসব। চট্টগ্রামের জব্বারের বলীখেলাও একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকোৎসব। বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত এ খেলা উপলক্ষ্যে সেখানে বিরাট মেলা বসে।

এছাড়া লোকউৎসবের পর্যায়ভুক্ত হলো বিভিন্ন ধরনের লোকগান। যেমন কবিগান, বিচার গান, আলকাপ গান ইত্যাদি। এইসব গানকে কেন্দ্র করে যে বিপুল জনসমাবেশ তাও লোক-উৎসব। বিয়ে একটি সামাজিক প্রথা হলেও, এর সঙ্গে জড়িত আচার-অনুষ্ঠানসমূহ লোকজ উৎসবের অংশ। বিয়ের পাত্র-পাত্রী দেখার পর থেকেই শুরু হয় নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যাতায়াতের পালা। বর-কনের বাড়িতে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হতে থাকে। আইবুড়োভাত, গায়ে হলুদ, অধিবাস ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান বিয়ের আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়। অতীতে কোথাও কোথাও দুপক্ষের লাঠিয়ালদের মধ্যে সংঘর্ষ হতো। বরপক্ষের লাঠিয়ালরা বিজয়ী হলে তবেই বর বিয়ের আসরে যেত। কখনও কখনও উভয়পক্ষের মধ্যে চলত ধাঁধার প্রশ্নোত্তরের পালা। আগের মতো এখনও বাড়ির ছেলেমেয়েরা বরকে বিয়ের আসরে যেতে বাধা দেয়, যতক্ষণ না বর তাদের পুরস্কৃত করে। উত্তরাঞ্চলে বরের সঙ্গে যেসব নারী আসে তাদের বলা হয় মওলানি। তাদের সামনে অনেকগুলো বালিশ পেতে দেওয়া হয়, যাতে তারা সেগুলো ডিঙিয়ে যেতে না পারে। এমনি সব ছোটো ছোটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ের মূল অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলা হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানকে আরও আনন্দঘন করে তোলে বিয়ের গান। বর্তমানে হলুদের অনুষ্ঠানটি বর-কনে উভয়পক্ষ থেকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়। আকিকা, অন্নপ্রাশন, খতনা প্রভৃতি পারিবারিক উৎসব বিয়ের তুলনায় এতটা ব্যাপক না হলেও কোথাও কোথাও বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই পালিত হয়।

বাঙালির লোক মানসে জাগ্রত থাকুক লোক-উৎসব ও উৎসবের আনন্দ। কারণ বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেই এই জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে সগৌরবে এগিয়ে যাচ্ছে। এই জাতি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গোপসাগরের সৈকত-ভূমির বদ্বীপ বাংলা অঞ্চলের শ্যামলা রঙের মানুষগুলো অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হলেও, মনের দিক দিয়ে অত্যন্ত ধনী। হাজার বছরের শোষণ-নির্যাতন সহ্য করতে করতে অবশেষে মুক্তি ও স্বাধীনতা মিলেছে রক্তের বিনিময়ে আর এই মুক্তির পেছনে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল তার নিজস্ব সংস্কৃতি। একজন সমাজবিজ্ঞানী যেমন পুরো বাংলাদেশটাকে বলেছিলেন একটি সবুজ গ্রাম, সেই গ্রামের মানুষগুলোর যেমন একটি নরম স্বর আছে, যে স্বরটি হলো শত শত নদীর কলস্বর, সেই স্বরটিকেই বলা যেতে পারে উৎসব প্রিয় বাঙালির লোকস্বর বা লোকসুর। যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে আনন্দ। আর আনন্দ মানেই উৎসব।

ড. শিহাব শাহরিয়ার: কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সাবেক কিপার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

মেধাস্বত্ব অধিকার: একটি অপরিহার্য অগ্রাধিকার

ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে

একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক অর্থনীতিতে জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতা হলো সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। যে জাতি তার মেধা ও উদ্ভাবনকে রক্ষা করতে পারে, সেই জাতিই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এগিয়ে থাকে। বাংলাদেশ আজ একটি ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে আছে– ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর মেধাস্বত্ব অধিকার বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস (আইপিআর) বিষয়ক দায়িত্ব ও চাপ উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে মেধাস্বত্ব অধিকারের গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আমাদের জাতীয় অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।

মেধাস্বত্ব অধিকার হলো সেই আইনগত অধিকার যা একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের মানসিক সৃষ্টি– যেমন সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, উদ্ভাবন, ব্র্যান্ড নাম, নকশা এবং বাণিজ্যিক রহস্যের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ দেয়। সাধারণত মেধাস্বত্ব অধিকার তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, কপিরাইট (Copyright), যা সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র ও সফ্টওয়্যারের মতো সৃজনশীল কাজকে সুরক্ষা দেয়। দ্বিতীয়ত, পেটেন্ট (Patent), যা নতুন ও উপযোগী উদ্ভাবনকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উদ্ভাবকের একচেটিয়া অধিকারে রাখে। তৃতীয়ত, ট্রেডমার্ক (Trademark), যা ব্যবসায়িক নাম, লোগো ও পণ্যের পরিচিতিকে রক্ষা করে। এর বাইরেও রয়েছে ভৌগোলিক নির্দেশক (GI Tag), যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বিশেষ পণ্যের পরিচয় নিশ্চিত করে, যেমন– বাংলাদেশের মসলিন কাপড় বা ইলিশ মাছ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস (TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) চুক্তির আওতায় আন্তর্জাতিকভাবে এই অধিকারগুলো স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। মেধাস্বত্ব অধিকার মূলত একটি সামাজিক চুক্তি– সমাজ উদ্ভাবককে সাময়িক একচেটিয়া সুবিধা দেয় এই প্রতিশ্রুতিতে যে সেই জ্ঞান একদিন সর্বজনের সম্পদে পরিণত হবে।

মেধাস্বত্ব অধিকারের প্রয়োজনীয়তা বহুমাত্রিক। প্রথম ও প্রধান কারণ হলো উদ্ভাবনের প্রণোদনা। যখন একজন উদ্ভাবক জানেন যে তার গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলাফল সুরক্ষিত থাকবে এবং তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন, তখনই তিনি নতুন কিছু সৃষ্টিতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হন। পেটেন্ট ব্যবস্থা না থাকলে ওষুধ কোম্পানিগুলো কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নতুন ওষুধ আবিষ্কার করত না। কারণ প্রতিযোগীরা সঙ্গে সঙ্গে সেই ওষুধ নকল করে বাজারে ছেড়ে দিত।

দ্বিতীয়ত, মেধাস্বত্ব অধিকার বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো সেই দেশেই বিনিয়োগ করে যেখানে তাদের প্রযুক্তি ও ব্র্যান্ড সুরক্ষিত থাকবে। বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় দেখা গেছে, শক্তিশালী মেধাস্বত্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

তৃতীয়ত, মেধাস্বত্ব অধিকার জ্ঞান হস্তান্তরকে উৎসাহিত করে– পেটেন্ট নথিভুক্তির মাধ্যমে প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়, যা অন্যরা আরও উন্নত প্রযুক্তি তৈরিতে ব্যবহার করতে পারে।

চতুর্থত, বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জামদানি শাড়ি, মসলিন,

রাজশাহীর সিল্ক, ঢাকার মোরব্বা– এই পণ্যগুলো বিশ্বে বিক্রি হলে দেশের কারিগর ও কৃষকরা ন্যায্য মূল্য ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবেন। GI ট্যাগ এই পণ্যগুলোকে নকল থেকে রক্ষা করে এবং রপ্তানি আয় বাড়ানোর পথ উন্মুক্ত করে।

বাংলাদেশে মেধাস্বত্ব অধিকার সংক্রান্ত আইনি কাঠামো নতুন নয়। ১৯৭৪ সালে প্রণীত কপিরাইট আইন, ১৯৬৫ সালের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন এবং ট্রেডমার্কস আইন আমাদের আইনি ভিত্তি তৈরি করেছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশ WIPO (World Intellectual Property Organization)-এর সদস্য হয় এবং পরবর্তীতে ট্রিপস চুক্তির আওতায় আসে। ২০০৩ সালে আধুনিক কপিরাইট আইন প্রণীত হয় এবং পেটেন্ট আইন সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জামদানি শাড়ি, ইলিশ মাছ, বাংলাদেশের চা, কালিজিরা চাল, রসমালাইসহ বেশ কয়েকটি পণ্যের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন করেছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি উৎসাহজনক অগ্রগতি। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সফ্টওয়্যার ও ডিজিটাল কন্টেন্টের কপিরাইট সুরক্ষার বিষয়েও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস প্রতিবছর তাদের 'স্পেশাল ৩০১ রিপোর্টে' বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষণ তালিকায় (Watch List) রাখে– যার অর্থ হলো মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কার্যকর পদক্ষেপের অভাব আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত। দেশে পাইরেটেড সফ্টওয়্যার, সংগীত, চলচ্চিত্র ও বইয়ের ব্যাপক ব্যবহার একটি সাধারণ দৃশ্য। নকল পণ্যের বাজার, বিশেষত ওষুধ, প্রসাধনী ও ইলেকট্রনিকস ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকেও হুমকিতে ফেলছে।

এলডিসি মর্যাদায় থাকাকালীন বাংলাদেশ TRIPS চুক্তির অনেক বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পেয়েছিল– বিশেষত ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে। এই ছাড়ের সুযোগে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প বিশ্বের একটি প্রধান জেনেরিক ওষুধ রপ্তানিকারকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর এই সুবিধাগুলো ক্রমশ সংকুচিত হবে এবং আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব নিয়ম পূর্ণমাত্রায় মেনে চলার চাপ বাড়বে। এই বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মেধাস্বত্ব ব্যবস্থার সামনে অনেক কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা একটি বড়ো সমস্যা। মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত মামলাগুলো প্রচলিত আদালতে দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হয়। একটি পেটেন্ট বা কপিরাইট লঙ্ঘনের মামলার নিষ্পত্তি হতে কয়েক বছর লেগে যায়, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কার্যকর প্রতিকার পায় না। বিশেষায়িত মেধাস্বত্ব আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠন এখন সময়ের দাবি।

দ্বিতীয়ত, সচেতনতার অভাব সর্বত্র বিদ্যমান। অধিকাংশ উদ্যোক্তা, গবেষক এবং সৃজনশীল পেশাজীবী মেধাস্বত্ব অধিকারের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নন বা কীভাবে তা নিবন্ধন করতে হয় তা জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেধাস্বত্ব বিষয়ক কোর্স এখনও যথেষ্ট নয়।

তৃতীয়ত, নকল পণ্য ও পাইরেসির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ অত্যন্ত দুর্বল। বাজারে প্রকাশ্যে নকল পণ্য বিক্রি হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এটি শুধু মেধাস্বত্ব মালিকদেরই ক্ষতি করে না, সরকারের রাজস্বও হ্রাস পায়।

চতুর্থত, গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগের অভাব আমাদের পেটেন্ট নিবন্ধনকে হতাশাজনক পর্যায়ে রেখেছে। বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক পেটেন্ট নিবন্ধনের সংখ্যা ভারত বা ভিয়েতনামের তুলনায় অতি নগণ্য। এর পেছনে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের মধ্যে সংযোগের অভাব, গবেষণা খাতে অপ্রতুল বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর উপযুক্ত পরিবেশের অভাব।

পঞ্চমত, ডিজিটাল পরিসরে মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন একটি নতুন ও জটিল চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারকে এখন একটি সামগ্রিক ও দূরদর্শী কৌশল নিয়ে মেধাস্বত্ব সংস্কারে অগ্রসর হতে হবে। সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপের কথা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমত, আইনি সংস্কার ও আধুনিকায়ন করতে হবে। পুরানো পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক আইন ডিজিটাল যুগের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একটি আধুনিক, সমন্বিত মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈবপ্রযুক্তি, ডিজিটাল কন্টেন্ট এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সুরক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। বিশেষত ঐতিহ্যগত *জ্ঞান* (Traditional Knowledge) সুরক্ষার জন্য আলাদা বিধান রাখা দরকার, যাতে আমাদের লোকজ চিকিৎসা, কৃষি পদ্ধতি এবং হস্তশিল্পের জ্ঞানকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া দখল থেকে রক্ষা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, বিশেষায়িত মেধাস্বত্ব আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উচ্চ আদালতের বিচারক ও আইনজীবীদের মেধাস্বত্ব বিষয়ক

বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা প্রয়োজন। মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, DPDT (Department of Patents, Designs and Trademarks) এবং কপিরাইট অফিসকে আরও শক্তিশালী ও ডিজিটালি সক্ষম করতে হবে। পেটেন্ট ও কপিরাইট নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অনলাইনে রূপান্তরিত করা এবং নিবন্ধনের সময়কাল ও ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা দরকার। বর্তমানে একটি পেটেন্ট নিবন্ধনে বছরের পর বছর লেগে যায়, এটি অগ্রহণযোগ্য।

চতুর্থত, গবেষণা ও উদ্ভাবন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যালয় (Technology Transfer Office) স্থাপন করা প্রয়োজন, যা গবেষকদের তাদের আবিষ্কার পেটেন্ট করতে ও বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগাতে সহায়তা করবে। গবেষণা খাতে জিডিপির অন্তত ১% বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয় অংশীদারিত্বকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া দরকার।

পঞ্চমত, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে মেধাস্বত্ব বিষয়ক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উদ্যোক্তাদের জন্য বিনামূল্যে মেধাস্বত্ব পরামর্শ ক্লিনিক স্থাপন করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (SME) জন্য পেটেন্ট নিবন্ধনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা উচিত।

ষষ্ঠত, ভৌগোলিক নির্দেশক সম্প্রসারণ করতে হবে। বাংলাদেশের অনেক ঐতিহ্যবাহী পণ্য এখনও GI ট্যাগ পায়নি। এই পণ্যগুলোর দ্রুত নিবন্ধন নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলোকে প্রিমিয়াম পণ্য হিসেবে তুলে ধরা গেলে রপ্তানি আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় কারিগরদের জীবনমান উন্নত হবে।

মেধাস্বত্ব অধিকার কোনো অভিজাত শ্রেণির বিলাসিতা নয়– এটি একটি জাতির জ্ঞান-অর্থনীতিতে প্রবেশের সিঁড়ি। বাংলাদেশের ৫৬ বছরের যাত্রায় আমরা কৃষি থেকে পোশাক শিল্পে এবং পোশাক শিল্প থেকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিস্তার লাভ করেছি। এখন সময় এসেছে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে আমাদের অর্থনীতির নতুন স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার। দক্ষিণ কোরিয়া বা সিঙ্গাপুর যখন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের শক্তিঘরে পরিণত হয়েছে, তার পেছনে একটি শক্তিশালী মেধাস্বত্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশকেও সেই পথে হাঁটতে হবে– কেবল পশ্চিমা চাপের মুখে নয়, বরং নিজের স্বার্থেই। আমাদের তরুণ গবেষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, লেখক, শিল্পী ও উদ্যোক্তাদের সৃষ্টিকে সুরক্ষিত করা গেলে তারা আরও বেশি বিনিয়োগ ও পরিশ্রম করবেন এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মেধার যথাযথ মূল্যায়নই একটি জাতির প্রকৃত সম্মান। বাংলাদেশ সরকারের কাছে আহ্বান– মেধাস্বত্ব অধিকারকে শুধু আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে নয়, বরং একটি জাতীয় সুযোগ হিসেবে দেখুন এবং এই সুযোগকে কাজে লাগান। কারণ আজকের উদ্ভাবনের সুরক্ষাই আগামীকালের সমৃদ্ধির ভিত্তি।

ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে: প্রফেসর, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, pranabpanday@yahoo.com

Youth Entrepreneurship & Startups for Students
কর্মসূচির উদ্বোধন

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ১১ই এপ্রিল সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Youth Entrepreneurship & Startups for Students (YESS Program)' শীর্ষক কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা জরুরি। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা মানসিকতার বিকল্প নেই।

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির শিক্ষার্থীদের উ ড্রাবনী কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্ষুদ্র সাবমেরিন নির্মাণ এবং রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি তৈরির মতো সৃজনশীল প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা দেশের প্রযুক্তি উন্নয়নের সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করবে।

শিল্প সচিব মো. ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. এম. সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ, iDEA প্রকল্প ও আইসিটি ডিভিশনের প্রকল্প পরিচালক মুর্তুজা জুলকার নাঈন নোমান এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং YESS প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণদের উদ্ভাবনী উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন: সাইমন ইসলাম

বাংলা সনের ইতিহাস ও বাংলা নববর্ষ

ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য

বাংলা সন ঠিক কবে, কীভাবে, কার দ্বারা চালু হয়েছিল, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে গবেষকগণ প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। তবে সংশয়াতীত ঐকমত্য আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত তথ্যের আলোকে প্রসঙ্গটি দেখার চেষ্টা করব।

সূর্য পরিক্রমার এবং চান্দ্র পরিক্রমার হিসাবে যে বর্ষ বা অব্দ গণনা করা হয়, সেগুলোকে যথাক্রমে সৌর এবং চান্দ্র বর্ষ বা অব্দ বা সন বলা হয়। এই দুধরনের বছরের মাসকে বলা হয় সৌর মাস এবং চান্দ্র মাস। নিজের অক্ষের ওপর ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী সূর্যকে ঘুরে আসতে সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড। আর চাঁদের যোগে ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের একটু বেশি। অর্থাৎ চান্দ্রবর্ষের চেয়ে সৌর বর্ষ মোটামুটি ১০/১১ দিনের বেশি হয়।

বাংলা সন হচ্ছে সৌর সন। আবার এর উৎস হচ্ছে চান্দ্র সন হিজরি। সম্রাট আকবর চান্দ্র ও সৌর সন মিলিয়ে অভিনব 'বাংলা সন'-এর সূত্রপাত করেন। বলাবাহুল্য, দিনপঞ্জি হওয়ার কারণে ৯৬৩ হিজরি সনের পর থেকে হিজরি সন সৌর দিনপঞ্জির বাংলা সনের তুলনায় ক্রমান্বয়ের এগিয়ে চলেছে এবং বাংলা সন পিছিয়ে পড়েছে।

একসময় ভারতবর্ষে বিভিন্নভাবে বর্ষ গণনার ধারা লক্ষ করা যায়। যেমন- বিক্রমাব্দ, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, বুদ্ধাব্দ, চৈতন্যাব্দ, লক্ষণাব্দ, বঙ্গাব্দ ইত্যাদি তার সাক্ষ্য বহন করছে। শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ উভয়টিই সৌর অব্দ। 'শাক্য দিন' গণনা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বাংলা সৌর দিনপঞ্জি মিলিয়ে নেওয়া হয়। খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৮ বিয়োগ করলে শকাব্দ মিলবে এবং বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫১৬ যোগ করলে শকাব্দ পাওয়া যাবে।

বাংলা সনের সঙ্গে শকাব্দের মাসগুলোকে যুক্ত করে বাংলা বার মাসের নাম রাখা হয়েছে এবং সেগুলো হয়েছে বিভিন্ন নক্ষত্রের নামে। যেমন- বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রাবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপ্রদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র মাসের নাম হয়েছে। শুধু অগ্রহায়ণ মাসের নাম কোনো নক্ষত্রের নামে হয়নি। আগে অগ্রহায়ণ ছিল বছরের প্রথম মাস। অগ্র মানে পূর্ব এবং আয়ন হচ্ছে বর্ষ। এজন্যই এই নামকরণ করা হয়েছিল।

বিশিষ্ট গবেষক ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'সমগ্র বাংলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে

নাই, তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবর আমলে, যখন সমস্ত বাংলাদেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।'

মোগল সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি (হিজরি ৯৬৩) দিল্লির সিংহাসনে আসীন হন। তখন এই উপমহাদেশে শকাব্দ, বিক্রমাব্দ, গুপ্ত সংবৎ বা গুপ্তাব্দ, শালিবাহন অব্দ, হর্ষাব্দ, পালাব্দ, লক্ষণ সংবৎ বা লক্ষণাব্দ, জালালি সন, সিকান্দার সন ইত্যাদি বিভিন্ন সনের প্রচলন ছিল। এগুলো ছিল অঞ্চলভিত্তিক, কোনোটিরই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি ছিল না। তদুপরি চান্দ্র বর্ষ হিজরি সনের নিয়মে ফসলের মরশুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাস ঠিক করা থাকে না। ফলে খাজনা আদায়ে অসুবিধা দেখা দেয়। এ সমস্যার সমাধানে সম্রাট আকবর তাঁর রাজসভার রাজজ্যোতিষী তথা পণ্ডিত আমির ফতেহ উল্লাহ সিরাজীকে সৌর বর্ষভিত্তিক ফসলি সন প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। রাজপণ্ডিত সম্রাটের নির্দেশ মোতাবেক সৌরমাস ভিত্তিক একটি ফসলি সন উদ্ভাবন করেন। অতঃপর সম্রাটের ক্ষমতায় আসীনের এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত আমির সিরাজী ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিলকে পহেলা বৈশাখ ধরে ৯৬৩ ফসলি সন গণনা করার রীতি চালু করেন।

১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন। এই নতুন বর্ষপঞ্জিটি প্রথমে তারিখ-ই-এলাহী নামে পরিচিত ছিল। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ বা ১১ই মার্চ এটি বঙ্গাব্দ নামে প্রচলিত হয়। নতুন এই সালটি আকবরের রাজত্বের উনত্রিশতম বর্ষে প্রবর্তিত হলেও তা গণনা করা হয় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর থেকে। কারণ এদিনে আকবর দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করেন।

তারিখ-ই-এলাহীর উদ্দেশ্য ছিল আকবরের বিজয়কে মহিমান্বিত করে রাখা এবং একটি অধিকতর পদ্ধতিগত উপায়ে রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করা। আবুল ফজল *আকবর নামা* গ্রন্থে বলেছেন যে, হিজরি বর্ষপঞ্জির ব্যবহার ছিল কৃষক শ্রেণির জন্য একটি ক্লেশকর ব্যাপার। কারণ চান্দ্র ও সৌর বর্ষের মধ্যে ১১/১২ দিনের ব্যবধান এবং এ কারণে ৩১ চান্দ্র বর্ষ ৩০ সৌর বর্ষের সমান ছিল। সে সময় চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা হতো। কিন্তু ফসল সংগ্রহ করা হতো সৌরবর্ষ অনুযায়ী। আকবর তাঁর রাজত্বের শুরু থেকেই দিন তারিখ গণনার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, কর্মোপযোগী ও গণনযোগ্য পদ্ধতি চালুর জন্য এ বর্ষপঞ্জি সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতেহ উল্লাহ সিরাজীকে প্রচলিত বর্ষপঞ্জিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ৯৬৩ হিজরির মহররম মাসের শুরু থেকে বাংলা বর্ষের ৯৬৩ অব্দের সূত্রপাত হয়। যেহেতু ৯৬৩ হিজরির মহররম মাস বাংলা বৈশাখ মাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সেহেতু চৈত্র মাসের পরিবর্তে বৈশাখ মাসকেই বাংলা বর্ষের প্রথম

মাস করা হয়। চৈত্র ছিল শক বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস, যা সে সময় বঙ্গে ব্যবহৃত হতো।

তারিখ-ই-এলাহী প্রবর্তন থেকে অতিক্রান্ত ৪৪৫ বছরের মধ্যে হিজরি ও বাংলা বর্ষপঞ্জির মধ্যে ১৪ বছরের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ হিজরিবর্ষ হচ্ছে চন্দ্রনির্ভর। আর বাংলাবর্ষ সূর্যনির্ভর। সৌরবর্ষ থেকে চান্দ্রবর্ষ ১১ দিন কম। তবে বাংলাবর্ষ ও গ্রেগোরিয়ানবর্ষের মধ্যে এই পার্থক্য নগণ্য, কারণ উভয়ই সৌরবর্ষভিত্তিক। তারিখ-ই-এলাহী প্রবর্তনের সময়ে গ্রেগোরিয়ান ও হিজরিবর্ষের মধ্যে পার্থক্য ছিল ১৫৫৬-৯৬৩ = ৫৯৩ বছর, যা বর্তমানেও কার্যকর। অর্থাৎ বাংলা সনের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে খ্রিষ্টীয় সন পাওয়া যায়।

'সুবা বাংলা' সম্রাট আকবরের আমলে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠা তার সচেতন আগ্রহে যে হয়নি তা বলা যায়। তবে বাংলা সন সৃষ্টির পেছনে সম্রাট আকবরের পরোক্ষ অবদানকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে আমরা যে বাংলা নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করছি তার পেছনে রয়েছে সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত একটি উৎসব, তার নাম 'নওরোজ'। অর্থাৎ নতুন দিন, নতুন বছর।

বাংলা নববর্ষ বাঙালির একটি সার্বজনীন লোক-উৎসব। বাঙালি এদিন আনন্দমুখর পরিবেশে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। এক সময় নববর্ষ পালিত হতো ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। প্রকৃত অর্থে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির। কারণ কৃষিকাজ ছিল ঋতুনির্ভর। অবশ্য সম্রাট আকবরের সময়ের বাংলার কৃষকরা চৈত্র মাসের শেষদিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূস্বামীর খাজনা পরিশোধ করত। পরেরদিন নববর্ষে ভূস্বামীরা তাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। এ উপলক্ষ্যে তখন মেলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। ক্রমান্বয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে পহেলা বৈশাখ আনন্দময় ও উৎসবমুখী হয়ে ওঠে এবং বাংলা নববর্ষ শুভদিন হিসেবে পালিত হতে থাকে।

অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরিই একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামেগঞ্জে-নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাদের পুরানো হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষ্যে তারা নতুন-পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যাবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করতেন। চিরাচরিত এ অনুষ্ঠানটি আজও আমাদের দেশে পালিত হয়। তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংস্কৃতি অঙ্গনে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয় । বর্তমানে বাংলা নববর্ষ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

(১) *বাংলা পিডিয়া* (৭ম ও ৮ম খণ্ড), প্রধান সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম, প্রকাশক: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। প্রকাশকাল: দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০১১।

(২) *প্রবন্ধ গুচ্ছ* (দ্বিতীয় খণ্ড), ড. বাসুদেব রায়, প্রকাশক-শ্রী সমীর রায়, আজকের অনুভব প্রকাশনা, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৩।

ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য: বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ড্রীমার্স কলেজ, এনায়েতপুর, সাভার ক্যান্টনমেন্ট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

চিংড়ি শিল্প উন্নয়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকারঃ প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা

ড. মন্মথ নাথ সরকার

বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক পণ্যের মধ্যে একমাত্র হিমায়িত খাদ্য পণ্য রপ্তানি করে ইতোমধ্যেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য হিমায়িত খাদ্য পণ্যের পুরোটাই দখল করে রেখেছে চিংড়ি। স্বাধীনতার পর থেকেই একটু একটু করে গলদা ও বাগদা চিংড়ি রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবেশ করে। এক সময় চিংড়ি উৎপাদন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টনে পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে প্রায় ৫৪,০০০ টন রপ্তানি করে বার্ষিক ৩,৬৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী ২য় পণ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশে চিংড়ি রপ্তানিতে ধস নামার প্রধান কারণ চিংড়ি চাষে অব্যবস্থাপনা, আধুনিক ও লাগসই পদ্ধতি ব্যবহারে অনীহা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অভাব। এসপিএফ পোনা, উপযুক্ত খাদ্য না থাকার জন্য রোগ-বালাইয়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না বাগদা ও

গলদা চিংড়ি

গলদা চাষ ব্যবস্থা। স্থবিরতা নেমে এসেছে বাগদা চিংড়ি চাষে। গলদা পোনা উৎপাদন সংকটে নিমগ্ন। তাই গলদা চাষ এক প্রকার বন্ধ বললেই চলে। শতাধিক হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ জনশক্তি বেকার হয়ে গেছে। আশিটির মতো গলদা ও বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি প্রায় বন্ধ হয়ে আছে।

বিশ্বের বিভিন্ন চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশ ক্রেতাদের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকার জন্য এবং চিংড়ি শিল্পে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সাউথ প্যাসিফিক হোয়াইট শ্রিম্প (ভেনামি চিংড়ি) চাষ শুরু করে সফলতা পেয়েছে। যদিও এটা বিদেশি প্রজাতি তথাপিও এই চিংড়ি চাষ করে এশিয়ার সকল চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশ বাগদা চিংড়ির পরিবর্তে ভেনামি চিংড়ি নামক এক নতুন জাতের চিংড়ি চাষ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বিশ্ব বাজারের চাহিদা পূরণ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়ে আসছে এবং বিশ্বব্যাপী ভোক্তাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। চীন, ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ বাগদা চিংড়ির চেয়ে ভেনামি চিংড়ি চাষে অগ্রগামী। একই প্রযুক্তির ফলপ্রসূ ব্যবহারের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের উদ্যোক্তাবৃন্দ ভেনামি চাষের জন্য এগিয়ে আসে।

নির্বাচনি অঙ্গীকার

মৎস্য খাত উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে– 'উন্নত মাছের প্রজাতি উদ্ভাবন, মানসম্মত ফিড উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণে গুরুত্ব দেওয়া হবে। রোগমুক্ত পোনা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, হ্যাচারিগুলোতে পিসিআর ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, মৎস্য চাষিদের বিজ্ঞানসম্মত অ্যাকুয়াকালচার গ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড তৈরি করা এই খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা'। এই অঙ্গীকারে চিংড়ি শিল্প রক্ষার একটি আশু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি ও যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের ওপর ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন নির্ভর করবে।

বর্তমান অবস্থা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানের মৎস্য অধিদপ্তর চিংড়ি চাষ, চিংড়ি হ্যাচারি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। মৎস্য অধিদপ্তর ডেটা বেজ প্রণয়ন, বার্ষিক উৎপাদন পরিসংখ্যান প্রকাশ, বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে চাষিদের উৎসাহিত করা, রপ্তানিজাত পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানি ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানিবৃদ্ধিকল্পে রপ্তানিকারকদের প্রণোদনা প্রাপ্তির প্রস্তাব অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। বেসরকারি উদ্যোক্তা চাষিদের কাছ থেকে চিংড়ি সংগ্রহ করে ভোক্তার চাহিদা মতো মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রস্তুত করে কাঙ্ক্ষিত ক্রেতার কাছে রপ্তানি করে। এক সময় বাংলাদেশের মূল রপ্তানি পণ্য ছিল হিমায়িত বাগদা চিংড়ি। ক্রেতা ছিল মূলত ইউরোপীয় দেশসমূহ। কিন্তু বর্তমানে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান। ক্রেতার চাহিদা মূলত ভেনামি এবং ক্রেতারা মোট রপ্তানি পণ্যের দশ শতাংশের বেশি বাগদা নিতে আগ্রহী নয়। এভাবে আন্তর্জাতিক বাজার ধরে রাখার জন্য ভেনামি উৎপাদন এখন অপরিহার্য। ভুক্তভোগী রপ্তানিকারক ও চাষিদের ক্রমাগত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তর শর্তসাপেক্ষে ভেনামি চিংড়ি চাষের পরীক্ষামূলক উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করে। সাফল্যজনকভাবে উৎপাদন সম্পন্ন করার

বাগদা চিংড়ি

পরে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয়। কিন্তু বাগদা চিংড়ি উৎপাদনে শত শত উদ্যোক্তা দেউলিয়া হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা, সুষ্ঠু নীতিমালার অভাবে এবং সংশ্লিষ্ট মহলের কাছ থেকে ঈপ্সিত সহযোগিতার অভাবে ভেনামি চিংড়ি শিল্প মুখ থুবড়ে পড়ে। চিংড়ি শিল্প আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। উপকূলীয় এলাকায় প্রায় তিন লক্ষ একর চিংড়ি চাষের জমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে, ১০৮টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি ও ৮৮টি চিংড়ি হ্যাচারির উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার হয়ে গেছে।

স্টেকহোল্ডারস ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য

এখানে অতি সংক্ষেপে চিংড়ি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

- **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়:** ব্লু ইকোনমি সেলের মাধ্যমে চিংড়ি বিষয়ক কর্মকাণ্ড অনুমোদন করে,
- **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়:** ফিশারিজ প্রোডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বিভিন্ন সমিতিকে চিংড়ি সম্প্রসারণে অনুদান প্রদান করে,
- **মৎস্য অধিদপ্তর:** চিংড়ি চাষ, হ্যাচারি পরিচালনার অনুমতি, উপকরণ আমদানির অনাপত্তি, রপ্তানির অনুমতি প্রদান করে,
- **বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট:** চিংড়ি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে,
- **বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতি:** চাষিদের কাছ থেকে পণ্য কিনে প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করে,
- **শ্রিম্প হ্যাচারি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ:** বাগদা ও ভেনামি চিংড়ির পিএল উৎপাদন করে,
- **বাংলাদেশ শ্রিম্প অ্যান্ড ফিশ ফাউন্ডেশন:** দেশি-বিদেশি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে,
- **মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশন:** জাহাজে আহরিত চিংড়ি রপ্তানি করে,
- **বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার এলায়েন্স:** বিপিসির অর্থায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে,
- **ফিশ ফার্ম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন:** বিপিসির অর্থায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে,
- **ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টার:** প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করে,
- **এফ.এ.ও :** প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করে থাকে।

ভেনামি চিংড়ি চাষের ইতিহাস

প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে ভেনামি বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করে। আশির দশকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ ইকুয়েডর উপকূলে ভেনামি চিংড়ি চাষ শুরু হয়। সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হয় এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকায় সম্প্রসারিত হয়। ফ্লোরিডা ও হাওয়াই উপকূলে উচ্চ-ফলনশীল জাতের উন্নয়ন ঘটে। এ কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন, একাধিক লাইন নিয়ন্ত্রণ (হার্ডি লাইন, গ্রোথ লাইন) ও নির্বাচন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রযুক্তি বিতরণ ও সম্প্রসারণ করে থাকে। ভেনামি চিংড়ি উত্তর আমেরিকা থেকে এশিয়ায় প্রবেশ করে মূলত চীন ও ভারতের ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। নিজস্ব প্রয়োজনে এক এক রকমের প্রোডাকশন লাইন উদ্ভাবিত হয়। চীন ও ভারতের মৎস্য বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের ট্রায়াল পর্ব শেষ করে এমনি এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে ভেনামি চিংড়ি উৎপাদনে চীন প্রথম স্থান ও ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এসব দেশে ভেনামি চাষে স্থানীয় পরিবেশের প্রভাব অন্য প্রজাতির সঙ্গে সংঘর্ষ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে দেখা যায় যে, ভেনামি বিদেশি বা বহিরাগত প্রজাতি হলেও এশিয়ার আবহাওয়া খাপ খেয়ে উচ্চফলনশীল জাত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে বিশ্ব বাজারে এটি তার সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নিয়েছে। ক্রমান্বয়ে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি এশিয়ার দেশ এবং সবশেষে বাংলাদেশ বাগদা চিংড়ির পাশাপাশি ভেনামি চিংড়ি চাষে সাফল্য লাভ করেছে।

ভেনামি চিংড়ি চাষ ভীতি ও অবৈজ্ঞানিক বিভ্রান্তি

বাংলাদেশের কিছু উৎসাহী মহল মনে করে যে, ভেনামি চিংড়ি দেশের পরিবেশ বিনষ্ট করে অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটি মহল ভেনামি চাষের কুফল তুলে ধরার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, চিংড়ি চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাফল্যের বিষয়টি কেন মেনে নিতে পারছে না? এতে লাভ হচ্ছে কার? এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার, পৃথিবীর ভিন্ন দেশের মৎস্যবিজ্ঞানী/প্রযুক্তিবিদ ভেনামিকে সবচেয়ে নিরাপদ, উচ্চ-ফলনশীল, রোগ-বালাই প্রতিরোধী বলে স্বীকৃতি দিয়ে উৎপাদনে মনোযোগী হয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশে ভেনামি চিংড়ি চাষ বিকাশ লাভ করতে পারছে না। ভেনামি চিংড়িকে গ্রহণ না করে বিশাল ক্ষতি হচ্ছে। সময় এসেছে বিভ্রান্তি দূর করে সঠিক পথ অবলম্বন করে ভেনামি চিংড়ি চাষের পথ সুগম করা।

পরীক্ষামূলক চাষ

বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ক্রমাগত আবেদন-নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুশীলন, জেবিএস ফুড প্রোডাক্টস লি., নিরিবিলি ফিশারিজ লি. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরীক্ষামূলক ভেনামি চাষের অনুমতি প্রদান করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলক ভেনামি চাষ সম্পন্ন করে এ বিষয়ক জাতীয় কমিটির সুপারিশক্রমে বাণিজ্যিক ভেনামি চাষের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে বিদেশ থেকে পিএল, খাদ্য ও উপকরণ আমদানির অনাপত্তি প্রদানে অহেতুক কালক্ষেপণের জন্য ভেনামি চিংড়ি চাষ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি।

বাণিজ্যিক চাষ ও সম্ভাবনা

পরীক্ষামূলক সফল চাষ পরিচালনার পর বিভিন্ন কোম্পানি যেমন– সীমার্ক ফুডস লি., জেবিএস ফুডস প্রোডাক্টস লি., এমইউ সী ফুডস, নিরিবিলি ফিশারীজ লি., ভেনামি অ্যাকোয়াকালচার পিএলসি, দি কেওড়া সীফুডস লি.সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতি একর জলায়তনে, প্রতি ফসলে একশো

ভেনামি চিংড়ি

দিনের কম চাষের সময়কালে ৩-৫টন ফলন পেয়েছে এবং চাষিদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে।

চিংড়ি শিল্প উন্নয়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম

চিংড়ি শিল্পকে সেবাদানের জন্য আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান এককভাবে দায়িত্ব পালন করছে না। নিম্নলিখিত দপ্তর-সংস্থা চিংড়ি শিল্পের জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক (মৎস্য চাষ) ও উপপরিচালক (চিংড়ি) ও উপপরিচালক (সম্প্রসারণ) নামক শাখা রয়েছে। উপপরিচালক (মৎস্য চাষ) শাখার অধীনে নতুন চিংড়ি হ্যাচারি নির্মাণ ও চাষ খামার নির্মাণে অনুমতি প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন, উপপরিচালক (সম্প্রসারণ) চিংড়ির জীবন্ত পোনা, মাদার ও উপকরণ আমদানির অনাপত্তি প্রদান করেন, কখনো কখনো নতুন চিংড়ি হ্যাচারি নির্মাণ ও চাষ খামার নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।

কোনো চাষি ভেনামি চিংড়ি চাষ কিংবা হ্যাচারি স্থাপন করতে চাইলে স্থনীয় উপজেলা/ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাছে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন, তা যাচাই-বাছাই করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর পার হয়ে সদর দপ্তরে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। সেবা সহজীকরণের আওতায় সময় কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

অগ্রাধিকার তালিকায় চিংড়ি চাষ বিষয়টি যুক্ত করা যেতে পারে। বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জীবন্ত চিংড়ি মাদার, পিএর/ পিপিএল, পলিকেট আমদানি ছাড়পত্র মিঠাপানির মৎস্য পণ্যের ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র আরো দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে জটিলতা, কালক্ষেপণ ব্যবস্থা দূরীকরণ করা যেতে পারে দেশের স্বার্থে।

মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন

মাছ ও চিংড়ির অন্যতম ভোক্তা হলো বাংলাদেশের ভোজন রসিক জনগণ। আমাদের দেশে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার জন্য প্রকৃতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় মাছ ও চিংড়ির সম্ভারে পরিপূর্ণ। নিজেদের চাহিদা মেটাতে সহজলভ্য আমিষ হিসেবে মাছকেই

ভেনামি চিংড়ি

কাছে পাই। আর এজন্যই আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। এক সময় বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। ইদানীং মাছের উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা বৃদ্ধি পাবার ফলে প্রাকৃতিক উৎসের পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করতে হচ্ছে। মিঠাপানির মাছ চাষে সাফল্য এসেছে, মৎস্য চাষ বিশেষ করে চিংড়ি চাষ এখন শিল্পের মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু কথা হলো চিংড়ি শিল্পের জন্য আমরা কী করতে পেরেছি? চিংড়ি উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি সবই বেসরকারি উদোক্তা পরিচালনা করে থাকে। সরকারি পর্যায়ে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ছত্রছায়ায় মৎস্য অধিদপ্তর উৎপাদিত চিংড়ির রপ্তানিকৃত পণ্যের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সকল পর্যায়ে উৎস সনাক্তকরণ (ট্রেসিবিলিটি) করে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে মনিটরিং করে থাকে। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা ও উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করে উৎপাদন বৃদ্ধির দিক নির্দেশনা প্রদান করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রণোদনা প্রদানে

ভেনামি চিংড়ি খামার

রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান করে থাকে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি পরিসংখ্যান প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে থাকে। চিংড়ি উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানি সবই বেসরকারি উদ্যোক্তা পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৎস্য মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর বিগত দেড় দশক চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে 'ধীরে চলো নীতি' গ্রহণ করে। অতিশয় উৎপাদনশীল 'ভেনামি' নামক নতুন জাতের চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে অনীহা/ বিধিনিষেধ আরোপ করার ফলে বিশ্বজয়ী ভেনামি জাতের চিংড়ি চাষ প্রসার লাভ করেনি। অথচ ভেনামি চিংড়ি মাত্র ১০০ দিনের চাষকালে রপ্তানিযোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত হয়, একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায় এবং একর প্রতি ৫ টন উৎপাদন করা সম্ভব।

উন্নয়ন সুপারিশমালা

চিংড়ি শিল্পকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা ও এই রুগ্ন শিল্পকে রক্ষায় নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করার সুপারিশ করা যায়। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে 'ভেনামি চিংড়ি চাষ উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। চিংড়ি চাষ জোন নির্ধারণ: গলদা, বাগদা ও ভেনামি জাতের চিংড়ি চাষের জন্য আলাদা জোন ঘোষণা করা যাতে এক প্রজাতির সঙ্গে অন্য প্রজাতি চাষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়,

২। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন,

৩। চাষিদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান,

৪। উন্নতমানের পোনা উৎপাদনের জন্য আধুনিক হ্যাচারি স্থাপন, বিএমসি ও এনবিসি স্থাপন করা,

৫। উন্নতমানের চিংড়ি খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা,

৬। চাষিদের জন্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা,

৭। মৎস্য মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে চিংড়ি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করা এবং এটি মৎস্য চাষ ও সম্প্রসারণ শাখা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা। যার তিনটি শাখা থাকবে, যেমন:

ক. গলদা চিংড়ি ইউনিট

খ. বাগদা চিংড়ি ইউনিট এবং

গ. ভেনামি চিংড়ি ইউনিট।

৮। চিংড়ি সম্পর্কিত যে-কোনো বিষয় সুরাহা করার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন করা,

৯। চিংড়ি ইউনিটে কর্তব্যরত সকলকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা,

১০। উপকূলীয় উপজেলাসমূহে চিংড়ি উন্নয়ন মেলা আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে উৎসাহিত করা,

১১। চিংড়ি মাদার উৎপাদনের জন্য বিএমসি ও এনবিসি স্থাপন করা,

১২। কোনো অবস্থাতেই নন-এসপিএফ বাগদা/ভেনামি পিএল উৎপাদন ও বাজারজাত না করা,

১৩। চিংড়ি ইউনিটের অধীনে স্বতন্ত্র সার্ভিলেন্স/ চিংড়ি শিল্প গোয়েন্দা ব্যবস্থা চালু করা।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত মৎস্য অধিদপ্তর অবিলম্বে 'ভেনামি চিংড়ি চাষ উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করে মৎস্য তথা চিংড়ি খাত উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার পূরণ করতে সচেষ্ট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দলের সমন্বয়ে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেড়/দুই লক্ষ বেকার লোকের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও লক্ষ-কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চিংড়ি সেক্টরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা এবং গণশুনানির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বলে মনে হয়। পরিশেষে এটুকুই বলা যায়, এক সময় বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। এখনো উপর্যুক্ত সকল সুপারিশমালা সমন্বিভাবে ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করা গেলেই বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার সফলতা লাভ করবে এবং বার্ষিক লক্ষ-কোটি টাকার চিংড়ি রপ্তানি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ড. মন্মথ নাথ সরকার: ভেনামি চিংড়ি চাষ বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শক, সম্মানিত ফেলো, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি এবং প্রাক্তন জাতীয় পরামর্শক, মৎস্য অধিদপ্তর, mnsarkermfap@gmail.com

বাতিঘরের কুতুবদিয়া

ইয়াকুব আলী

কুতুবদিয়ার প্রতি কেন যেন একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল শৈশব থেকেই। হয়ত দ্বীপ কিংবা দুর্গম বলে। নামটির সঙ্গে পরিচিতি ক্লাস ফোরের *পরিবেশ পরিচিতি সমাজ* বই থেকে। বইয়ে দেশের বিখ্যাত স্থানগুলোর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছিল। যেমন- ভৈরববাজার: রেলওয়ে জংশন। ভৈরব রেল সেতু বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু ইত্যাদি। কুতুবদিয়ার ক্ষেত্রে লেখা ছিল: এখানে একটি 'বাতিঘর' আছে। এ পর্যন্তই।

পরে আরো শুনেছি প্রতিবেশী ইসরাইল কাক্কুর গল্প। ছোটো থেকেই তাঁকে দেখেছি আয়েশি জীবনযাপন করতে। পরিষ্কার জামাকাপড় পরতেন। রেডিওর খবর শুনতেন। দম দেওয়া ক্যামি ঘড়ি ব্যবহার করতেন। সাইকেলটির যত্ন নিতেন। বলজয়েন্ট ও চেইনে নিয়মিত নারিকেল তেল দিতেন। কাঠের চৌকির ওপর কাঁথা দুই ভাজ করে বিছানা বানিয়ে ঘুমাতেন। সারাদিন শুয়ে শুয়েই কাটাতেন। তার পঞ্চম স্ত্রী চাচি আম্মাকে দিয়ে পাসহ গা টেপাতেন। বাবুগিরি বললে আমার চোখের সামনে এই লোকটির চেহারাই ভেসে উঠত। ভারিক্কি চালচলনের কারণে বড়োরা তাকে 'গেভেটি (গ্র্যাভিটি)' বলে কটাক্ষ করত। তার পিতা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ-কাম-সালসা ব্যবসায়ী। জমিজমা শেষ করে কাক্কু এলাকা ছাড়েন ১৯৮৬ সালে। এক সময় তার ঠাঁই হয় ঢাকার কড়াইল বস্তিতে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাবলিক হেলথের বড়ো এক কর্তার আশীর্বাদে ইসরাইল কাক্কুর সরকারি চাকরি হয়েছিল। পোস্টিং হয়েছিল কুতুবদিয়ায়। যোগদানের পর বাড়ি এসে তিনি আর কোনোদিন চাকরিতে ফিরেননি!

কুতুবদিয়া বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপ। দ্বীপ উপজেলা। সরকারি গেজেট অনুসারে, দেশে দ্বীপ উপজেলা আছে ৫টি: চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ, নোয়াখালীর হাতিয়া, ভোলার মনপুরা, পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী ও কক্সবাজারের কুতুবদিয়া।

কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের দিকে চকোরিয়া পার হয়ে বরইতলী একতা বাজার। এ পয়েন্ট থেকে চট্টগ্রাম ৯২ কিলোমিটার আর কক্সবাজার ৬৬ কিলোমিটার। একতা বাজার থেকে পেকুয়াগামী নতুন রাস্তা দিয়ে ১০/১২ কিলোমিটার এগোলে পেকুয়া উপজেলা সদর। সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে মগনামা ঘাট। মগনামা ঘাটে গাড়ি পৌঁছার পর শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। সকাল থেকেই আবহাওয়ার মতিগতি ভালো ছিল না। চকোরিয়া পৌঁছতে না পৌঁছতেই আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। বৃষ্টির কারণে উপস্থিত নারী-পুরুষ সকলেই ঘাটের দোকানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আমাদের গাইড কক্সবাজারের ছেলে সানি সেদিনকার মতো ওপারে যাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়। এতটা পথ আসা তাহলে বিফলেই গেল!

মগনামা ঘাটটি কুতুবদিয়া চ্যানেলের তীরে। কুতুবদিয়া ও পেকুয়ার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগরের প্রবাহটি 'কুতুবদিয়া চ্যানেল' নামে পরিচিত। এ চ্যানেল খুব উত্তাল থাকে বলে জেনেছি। উত্তাল সাগর পাড়ি দেওয়ার একটি রোমাঞ্চ অনুভব করেছি সব সময়। সঙ্গী রাকিব বরিশালের দুঃসাহসী ছেলে। গাদাগাদি করে লোকজন দাঁড়িয়েছিলেন দোকানে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এর মধ্যে দেখলাম এক লোক বড়ো সাইজের পলিথিন কিনছেন দোকান থেকে। দাম ৩০ টাকা। আমরাও কিনলাম বড়ো সাইজের পলিথিনের স্বচ্ছ ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর মাথা ও শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঢুকিয়ে বেরিয়ে আসি দোকান থেকে।

সানি বলল, স্যার, গাড়িতেই গিয়ে বসুন। যাওয়া তো হচ্ছেই না। রাকিব ধমক লাগায়, কী কন? যেতে হবেই। এর মধ্যে বৃষ্টি ধরে আসে। তবে বাতাস বইছিল জোরে। আপাতত ওপারে যাওয়ার ভরসা নেই। সাগরে লক্ষ করি, কিছুক্ষণ আগে ঘাট ছেড়ে যাওয়া জোড়া দেওয়া নৌকায় পার হচ্ছে পাজেরো জিপ। আশা জাগল মনে। ৫/৭ মিনিট পরে একটি স্পিডবোট ঘাটে ভিড়ে। স্বস্তির নিশ্বাস!

বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে। আমরাও পলিথিন খুলে ফেলি। একটি কাঠের ডেনিশ নৌকায় যাত্রীরা উঠছেন হুড়োহুড়ি করে। আমরাও উঠে পড়ি। ততক্ষণে স্পিডবোটটিও যাত্রী ওঠাতে শুরু

করেছে। রাকিব বলল, স্যার, স্পিডবোটে চলেন। স্পিডবোট ডুবে না। স্পিডবোটের ভাড়া ১২০ টাকা। জেটির একপাশে প্যারাবন। জেটির গোড়ায় তখন বিশাল বিশাল ঢেউ। স্পিডবোটটি দুলছে যেন উল্টেই যাবে। জেটির পিলারে আঘাত করছে উত্তাল ঊর্মিমালা। যাত্রীর কোটা পূর্ণ হওয়ায় স্পিডবোট ছাড়ে। চ্যানেল কতদূর অতিক্রম করার পর মনে হলো ঢেউ কমেছে। কিন্তু একটু পর পর স্পিডবোট যেন আছড়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে কোমর ভেঙ্গে যাচ্ছে। হিপ উল্টে পাল্টে না বসলে হিপের কাজ শেষ, পাশের জনকে বললেন এক যাত্রী।

স্যার, টের পাওয়া যাচ্ছে? রাকিব জিজ্ঞেস করল।
'ঢেউ ছোটো কিন্তু আছাড় বড়ো'— জবাবে বলি।

এ পথে পাইলস অপারেশনের রোগীর খবর আছে। কুতুবদিয়া চ্যানেল সংকীর্ণ। সাগরের অপর পাড়ে সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নোয়াখালী ও হাতিয়ার মাঝে সন্দীপ চ্যানেলও কিন্তু এর চেয়ে ঢের প্রশস্ত। যাহোক, এক সময় আছাড় কমে আসে। আমরাও কুতুবদিয়ার ঘাটের নিকটবর্তী হই। চ্যানেল পাড়ি দিতে স্পিডবোটে সময় লাগল মোটে সাত মিনিট। একটি নৌকা পার হয়ে জেটির সিঁড়িতে উঠি। ল্যান্ডিং ব্রিজটি তেলের ড্রামে ভর্তি। সদ্যই এগুলো নামানো হয়েছে নৌযান থেকে। ঘাটের নাম বড়ঘোপ ঘাট। কুতুবদিয়ায় ঘাট আছে মোট ৫টি: বড়ঘোপ, ধুরুং, আবদুল বলি, দরবার, পূর্ব আলী আকবর ডেইল। আলী আকবর ডেইল একটি ইউনিয়নের নাম। দ্বীপের দক্ষিণাংশে এর অবস্থান। কুতুবদিয়ার ইউনিয়নের সংখ্যা ৬টি। বড়ঘোপ ঘাটে আছে যাত্রীদের একটি বিশ্রামাগার। দেয়ালে স্থাপিত ফলকে লেখা: 'সৌদি আর্থিক অনুদানে নির্মিত জেটি সংযোগ সড়ক ও বিশ্রামাগার; নির্মাণ তারিখ: অক্টোবর ১৯৯৬।' জেটির ব্রিজ পার হয়ে দেখি হাজারে হাজারে বাঁশের ঝাঁক ভেড়ানো আছে ঘাটে। এগুলো এসেছে চট্টগ্রামের বাঁশখালী থেকে। কুতুবদিয়ায় বাঁশঝাড় নেই। একটি ইজিবাইক নেওয়া হয় রিজার্ভ।

ঘাট থেকে বেরিয়ে অল্প দূরে উপজেলা সদর। কুতুবদিয়া প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। এসি ল্যান্ড অফিসের পাশে একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে 'সিটিজেন পার্ক'। জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দুপাশে বাজার ও বিভিন্ন স্থাপনা দেখতে থাকি। এগোয় ইজিবাইক।

এ দ্বীপে পলিথিনের সাংঘাতিক দাপট। লবণ চাষে কুতুবদিয়া মনে হয় এক নম্বরে। দ্বীপের দক্ষিণ দিকটাতে শুধুই লবণ ক্ষেত আর লবণ ক্ষেত। জমি থেকে লবণ সংগ্রহে কালো পলিথিন ব্যবহার করা হয়। ব্যবহৃত পথিলিন পরে বাড়ির সীমানা প্রাচীর, ঘরের বেড়া ও চালে ব্যবহৃত হয়। খড় শুকাতেও পলিথিন, খড় ঢেকে রাখতেও পলিথিন। পলিথিনে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

শীতকাল লবণ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সাগরের পানিকে বিশেষ কায়দায় জমিতে ঢোকানো হয়। আগেই কয়েক স্তর পলিথিন বিছিয়ে রাখা হয় জমিতে। থিতিয়ে পলিথিনে জমা হলে রোদে শুকানো হয়। শীত শেষ হলেও এখনো চলমান রয়েছে লবণ সংগ্রহের কাজ। বৃষ্টির আশঙ্কা দেখে ক্ষেতের মধ্যে লবণশুদ্ধ পলিথিন গুটিয়ে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাগরের পানিতে লবণের পরিমাণ ২.৫%।

রাস্তা পাকা। এলাকাটি না গ্রাম, না শহর। একটি গ্রামে গিয়ে থামে ইজিবাইক। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে উইন্ডমিল বা বায়ু বিদ্যুতের টারবাইন। এ জায়গাটি দ্বীপের সর্বদক্ষিণের অংশ। গ্রামের নাম তাবলারচর। ইউনিয়ন আলী আকবর ডেইল। এ জায়গাটা সাগরের পাশেই। বেড়িবাঁধের ভেতরের দিকে একেকটি উঁচু লোহার পিলারের মাথায় ফ্যান। ফ্যানে তিনটি করে ব্লেড।

পাশে লবণ ক্ষেত। জানা গেছে, বায়ুকল থেকে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫০টি টারবাইন স্থাপনের পর অবকাঠামো ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'য় বিধ্বস্ত হয়। সিডরের পর ২০০৮ সালে টারবাইনগুলো বসানো হয়েছিল। দীর্ঘদিন কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর ২০১৭ সালে নতুন করে আরো টারবাইন বসিয়ে চালু করে আবার বন্ধ করা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন। এখন পুরোপুরিই বন্ধ। এখানে উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ফেনীর সোনাগাজীতে দেশের প্রথম বায়ুকল স্থাপন করা হয়েছিল। দেশের তৃতীয় ও সর্ববৃহৎ বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র কক্সবাজারের খুরুশকুলে। জাতীয় গ্রিডে সেখান থেকে ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হয় বলে জানা যায়। বায়ুবিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উদাহরণ। সরকারিভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এ খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের। বাতাসের বেগ মোটামুটি ৬ মিটার/সেকেন্ড ও তার বেশি হলে বায়ুকলের টারবাইন ঘোরে। সে হিসেবে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা বায়ুকলের জন্য উত্তম। কুতুবদিয়ায় বায়ুবিদ্যুৎ সাফল্যের মুখ দেখেনি। সবশেষে ২০২৩ সালে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় কুতুবদিয়া দ্বীপবাসী। সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে সাগরের নিচ দিয়ে নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ।

বেড়িবাঁধের নিচেই সমুদ্র। ভাঙনপ্রবণ বলে দ্বীপের এ অংশে বিশাল বিশাল স্যান্ডব্যাগ ও সিমেন্টের ব্লক দিয়ে ভাঙন রোধ করা হচ্ছে। সমুদ্রতীরে ড্রোন ব্যবহার করে ছবি তোলার আয়োজন করা হয়। আবদুল হাদি সিকদার পাড়া জামে মসজিদে জুমার নামাজ শেষে পরবর্তী গন্তব্যে রওয়ানা হই। গন্তব্য কুতুবদিয়া বাতিঘর।

বঙ্গোপসাগরে বড়ো একটি মাছের মতো ভেসে আছে কুতুবদিয়া দ্বীপটি। না, ঠিক মাছ না, আকৃতি অনেকটা ব্যাঙাচির মতো। মাথা উত্তরে, লেজ দক্ষিণে। দ্বীপের দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্তের জমিতে লবণ চাষ করা হয়। মধ্য ও উত্তর পশ্চিম দিকে শাকসবজিসহ ধানের চাষ করা হয়েছে। এখন ধানকাটার মৌসুম। তবে ধানি জমি কম– খুবই কম। সবজির চাষও করা হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতিতে।

আড়াইটার বেশি বেজে যাওয়ায় আমাদের ক্ষুধা তখন চরমে। দ্বীপের পশ্চিম পাশের গ্রামের ভেতর দিয়ে রাস্তা। যন্ত্রণার পলিথিন সর্বত্র। পলিথিন বন্ধ হয় না কেন? রাকিব প্রশ্ন করে। ড্রাইভার জবাব দেয়, বাঁশের যা দাম, পলিথিন বন্ধ হলে আমরা টিকব কীভাবে? ঘর বানাবো কী দিয়ে? ন্যায্য কথা। বাঁশ, শন বা এ জাতীয় বিকল্প কিছুই তো নাই। ঢেউটিন যা আছে তার কোয়ালিটিও পলিথিনের চেয়ে খুব বেশি ভালো না।

আমাদের অস্থিরতা দেখে ড্রাইভার দূরে বাতিঘরের টাওয়ার দেখালো। কিন্তু জায়গাটাতে যেতে হয় অনেক রাস্তা ঘুরে। শেষ পর্যন্ত পৌঁছাই আরাধ্য স্থানে। কত দিনের স্বপ্ন বাতিঘরকে ঘিরে! সমুদ্র উপকূলে বেড়িবাঁধের ভেতরেই বাতিঘরের অবস্থান। চারদিকে নবনির্মিত সীমানা প্রাচীর থাকলেও গেটে আটকানোর কাউকে দেখলাম না। ৩/৪ জন শ্রমিক কাজ করছিল কম্পাউন্ডে।

প্রকল্প সম্পর্কে কোনো তথ্য বোর্ড নেই। এক জায়গায় সাইন দেখলাম চিটাগাং ড্রাই ডকের। ওরাই নির্মাণ কাজ চালাচ্ছে। ভেতরে পুকুর আছে। রেস্ট হাউসও তৈরি করা হয়েছে। কনক্রিটের বেসমেন্টের ওপর প্রায় ১০০ মিটার উঁচু স্টিলের ফ্রেম দিয়ে হাল আমলের নতুন বাতিঘরের টাওয়ারটি তৈরি করা হয়েছে। ভেতর দিয়ে উপরে ওঠার সিঁড়ি আছে। বেসমেন্টে হাতে লেখা আছে: 'বাতিঘরের উপরে উঠা নিষেধ। ১০০ হাত দূরে থাকুন।'

এখানে বলে রাখা ভালো, ১৬৪ বছর আগে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা সাগর সংযোগকারী কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপন করে চট্টগ্রাম বন্দর। বন্দর মানে দুটো জেটি। মানে ঘাট। এরও শত শত বছর আগে থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার বা রেঙ্গুন রুটে জাহাজ চলাচল করত। কারণ এ অঞ্চলে রাস্তাঘাট ছিল না। বিশেষ করে চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে সড়ক অবকাঠামো বলতে কিছুই ছিল না। কয়েকটি উদাহরণ দিই। সাহিত্যিক আবুল ফজলের (চট্টগ্রাম) আত্মজীবনী *রেখাচিত্র* থেকে জানা যায়, প্রায় ১০০ বছর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পাস কোর্সের ছাত্র থাকাকালে তার এক বন্ধুর সঙ্গে পায়ে হেঁটে চার দিনে ঢাকা থেকে কুমিল্লা হয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। ঢাকায় আসা-যাওয়া হতো চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ হয়ে। জোড়াতালি দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মিত হয় সেদিন ১৯৬১-১৯৬২ সালে। উদ্যোগই নেওয়া হয় ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক ছিল হাতি চলাচলের উপযোগী। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে ঘোড়ার গাড়ি চলার সুবিধার্থে ইট-সুরকির রাস্তার প্রচলন হয়। তখন পর্যন্ত দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম সড়কটি পাকা করার মতো অবস্থায় আসেনি। ১৯৬৩ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের নদীগুলোতে রো রো ফেরি সার্ভিস চালুর মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর কাঁচপুর ব্রিজ নির্মিত হয়। তার পরও ফেরি ছিল গজারিয়া ও দাউদকান্দিতে। ১৯৯১ সালে মেঘনা সেতু ও ১৯৯৪ সালে গোমতী সেতু চালু হলে এ সড়কে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়। এদিকে,

চট্টগ্রাম-লাকসাম-চাঁদপুর রুটে রেললাইন স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। চট্টগ্রামের সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল হাটা, নৌ অর্থাৎ সমুদ্রপথে। এ কারণেই রাতে নৌচলাচলের ক্ষেত্রে কুতুবদিয়া বাতিঘরের গুরুত্ব ছিল অশেষ।

বাতিঘর হচ্ছে সুউচ্চ টাওয়ার, মিনার বা দালান। কাঠের বা কনক্রিটের স্থাপনা। চূড়া থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় আলো ফেলে জাহাজের নাবিকদের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। সমুদ্রের অগভীর অঞ্চল, প্রবালসমৃদ্ধ অঞ্চল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সম্পর্কে সতর্ক করাও বাতিঘরের উদ্দেশ্য। এসব কারণে চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর আগে কুতুবদিয়ায় বাতিঘর স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবদিয়া দ্বীপের আলী ফকির ডেইল নামক স্থানে বাতিঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়। কর্ণফুলী নদীর মোহনা থেকে এ জায়গার দূরত্ব মাত্র ৪০ মাইল। গেলে দেখতে পাবেন শত শত নৌযান নোঙর করা আছে কুতুবদিয়ার সাগরে। বাতিঘরে ঘূর্ণায়মান বাতি স্থাপিত হয় ১৮৯২ সালে। পাথরের ভিতের ওপর নির্মিত বাতিঘরটির উচ্চতা ছিল প্রায় ৪০ মিটার। আদিম বাতিঘরটি ছিল ৮তলার গোলাকৃতি টাওয়ার। নিচতলা মাটির নিচে। দেয়াল ছিল পুরু। প্রতি তলার উচ্চতা ছিল প্রায় ৫ মিটার। প্রতি কক্ষে ছিল কাঁচের জানালা। পাটাতন ও সিঁড়ি কাঠের। সবার উপরের তলায় আট ফিতার ল্যাম্প বসানো ছিল। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতো নারিকেল তেল! একটি কাঠের ফ্রেমে রাখা বাতিটি প্রতিদিন সূর্যাস্তের আগে জ্বালানো হতো। রাতের বেলায় ৩৫ কিলোমিটার দূর থেকে নাবিকরা আলো দেখতে পেত।

নির্মাণের ১০৮ বছর পর পাকিস্তান আমলে ১৯৫৪ সালে বাতিঘরটি পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সরকার ১৯৬৫ সালে আগের স্থান থেকে দুই কিলোমিটার পূর্বে বাঁধের ভেতরে নতুন করে একটি বাতিঘর নির্মাণ করে। টাওয়ারটি হয় লৌহ কাঠামোর উপর। প্রাচীন আলোক-উৎপাদন প্রক্রিয়া বাতিল করে সে সময়ে প্রচলিত আধুনিক পদ্ধতি চালু করা হয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পাকিস্তান আমলেই এই বাতিঘরটি অকেজো হয়ে যায়। পরে ক্রমাগত ভাঙনের মুখে এই বাতিঘরটিও বিলীন হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে কুতুবদিয়ার দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নে বাতিঘর নির্মাণ করা হয় স্টিলের অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে একমাত্র ওয়্যারলেস যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে ডিজেল চালিত জেনারেটরের মাধ্যমে ১৫টি ব্যাটারি চার্জ করা হয়। ব্যাটারির মাধ্যমে বাতিঘরে জ্বালনো হয় আলো। এ বাতিঘর ছাড়াও দেশে বাতিঘর ছিল চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সুন্দরবনের হিরন পয়েন্ট এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারায় (নরমান পয়েন্ট)। এগুলোর সব কটি তৈরি হয়েছে স্বাধীনতার পর। কোনোটি ২০০০ সালেরও পরে। কুতুবদিয়ার বাতিঘরটিই প্রাচীন বিধায় সাধারণ্যে অনেক বেশি আলোচিত।

প্রতিষ্ঠার পৌনে দুইশো বছর পর আধুনিকায়ন করা হচ্ছে কুতুবদিয়া বাতিঘরের। পুরাতন টাওয়ারের পাশে নতুন করে টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চ। সে বছরই কাজ শুরু হয়ে ইতোমধ্যে শেষও হয়েছে। নতুন করে সাজে সজ্জিত কুতুবদিয়ার বাতিঘর।

এছাড়াও নতুন করে স্থাপন করা হয়েছে আরও চারটি বাতিঘর। পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ, ভোলার চর কুকরীমুকরী ও বাগেরহাটের দুবলার চরে নতুন বাতিঘর স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন ও বিখ্যাত বাতিঘর হচ্ছে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের আড়াইশো বছর আগে এটি স্থাপিত হয়েছিল।

কুতুবদিয়ার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বঙ্গোপসাগর আর পূর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেল। লবণ আহরণ দ্বীপবাসীর প্রধান পেশা। আরেক পেশা সমুদ্রে মৎস্য আহরণ। 'জমিতে লবণ আর দরিয়ার মাছ ছাড়া আমাদের রোজগারের আর কোনো উপায় নাই', বললেন ইজিবাইকের চালক। দ্বীপের পূর্বাংশ অধিক অগ্রসর। উপজেলা সদর, বাজার, সরকারি কলেজ, মহিলা কলেজ, মাদ্রাসা সবই এদিকে। চ্যানেল সংলগ্ন কুতুব আউলিয়ার উত্তরসূরি শাহ আবদুল মালেক আল কুতুবীর (র.) মাজার। মাজারের নিকটে বিসিকের লবণ উৎপাদন প্রদর্শনী খামার। লবণ মৌসুমে প্রতিদিন নাকি অসংখ্য দর্শনার্থী ভিড় জমায়।

কুতুবদিয়ার সমুদ্রসৈকতের দৈর্ঘ্য ১৬ কিলোমিটার। সূর্যাস্ত দেখার জন্য এ সৈকত নাকি অতুলনীয়। তবে তা দেখার জন্য আমার মন সায় দেয়নি। দীর্ঘসময় ধরে বসে থাকার উপযোগী নয় এখানকার বিচ। দ্বীপের দক্ষিণাংশে বায়ুকলের পাশে সাগরপাড় আছে তবে সৈকত নেই। বেড়িবাঁধের ওপর দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটা চলে। এখানে বেলাভূমি নেই।

উত্তরাংশে বাতিঘরের নিকট ঝাউবনের পাশে নির্জন সৈকত। সৈকতে ছায়া নেই। আমরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছেছি বেলা তখন সাড়ে তিনটা। সে সময় কোনো দর্শনার্থী ছিল না। জেলেদের তৎপরতা না থাকলেও দূরে নৌযান নোঙর করা ছিল অসংখ্য। কুতুবদিয়ার সৈকতের প্রধান আকর্ষণ নাকি গাঙচিল। গাঙচিলের ডানা ঝাপটানোর দৃশ্য দেখতে প্রকৃতিপ্রেমীরা কুতুবদিয়ায় ভিড় জমায়। অবশ্য গাঙচিল আমাদের নজরে পড়েনি একটিও। এখানে সাগরের জোয়ার-ভাটা নির্ণয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই সাগরে নামা নিরাপদ নয়। ভাটার সময় সাগর বিপজ্জনক হয়ে থাকে। নির্জন সৈকতের বেলাভূমিতে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ও ছবি তুলে ফিরতে হয়। পেকুয়া চৌমহনীতে পৌঁছে আমরা যখন দুপুরের খাবার খেতে বসি তখন বিকেল ৫টা। রেস্টুরেন্টে তরকারি ছিল, ভাত ছিল না। অন্য দোকান থেকে ভাত এনে পরিবেশন করে। খাবার মেনু খুব ভালো নয়, কিন্তু মন বাতিঘরের কুতুবদিয়ার স্মৃতির সজীবতায় ভরপুর।

ইয়াকুব আলী: অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, yeakub07@gmail.com

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের সংস্কৃতির ফল্গুধারা

ড. সাইমন জাকারিয়া

বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের শুরু প্রায় দুই সহস্রাব্দ বছর আগে। ইতিহাসের কালরেখায় তার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন পুণ্ড্রনগর তথা মহাস্থানগড়। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গড়ে ওঠা এই পুণ্ড্রনগরের সাথে প্রাচীন বাংলার নৃত্য, গীত ও নাট্যাভিনয়ের সম্পর্ক রয়েছে। কহলন পণ্ডিতের *রাজতরঙ্গিণী*তে তার কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। জানা যায়, অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মিরের রাজা ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরের নর্তকী কমলার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অপরদিকে সন্ধ্যাকরনন্দীর *রামচরিতে* পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা রাম পালের রাজধানী বরেন্দ্র অঞ্চলের রামাবতী নগরের সংগীত চর্চার নানাবিধ পরিচয় গ্রন্থিত রয়েছে।

শুধু তাই নয়, ভারতের মালদহ জেলার খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের একটি শ্লোক থেকে জানা যায়, সে সময় বরেন্দ্র অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে সংগীতের এমন প্রসার ছিল যে, তখনকার লোককবি ও গায়করা নানা ধরনের গীত রচনা করে বিভিন্ন স্থানে গেয়ে বেড়াতেন। গ্রাম্য রাখালেরাও মাঠে মাঠে গান গেয়ে বেড়াতো, বণিকগণ অবসর সময়ে বিপণিতে বসে গান গাইতেন, ছোটো ছোটো বালক-বালিকারাও গৃহাঙ্গণে গানের চর্চা করত, এমনকি বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত পোষা শুকপাখিরাও গান গাইত। এর অর্থ সে সময় বরেন্দ্রভূমি এলাকার সংগীত-ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাণবন্ত, সমৃদ্ধ ও সর্বব্যাপী ছিল।

আবহমানকালের এই গানের ঐতিহ্য স্পর্শ করেছে প্রাচীন বাংলার *চর্যাপদ* রচনার সময়কেও। *চর্যাপদের* উৎসভূমি হিসেবে স্বীকৃত প্রাচীন বাংলার সোমপুর মহাবিহার তথা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের মন্দিরপাত্রের টেরাকোটা চিত্রে বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত টেরাকোটা চিত্রের *চর্যাপদের* বর্ণনার হুবহু প্রতিরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে প্রাপ্ত একটি টেরাকোটার মৃৎফলকে পদ্মফুলের পাঁপড়ির উপর নৃত্যরত একটি নারীশিল্পীকে আবিষ্কার করা যায়, যা *চর্যাপদে* বর্ণিত 'এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি/তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি'র সাথে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

কে না জানে, *চর্যাপদ* শুধু গানের ঐতিহ্য হিসেবে প্রসিদ্ধ নয়, একই সঙ্গে প্রাচীন বাংলার নাট্য, নৃত্য, বাদ্যের ঐতিহ্যের পাশাপাশি *চর্যাপদ* ধারণ করে আছে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়, উৎসব, জীবনাচার, সাধনার নানা প্রসঙ্গ। এর বাইরে *চর্যাপদের* গভীরে গ্রন্থিত হয়ে আছে বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের পরিচয় এবং বাঙালি ও বিচিত্র নৃগোষ্ঠীর ভাবসাধনার সামগ্রিক আখ্যান। আসলে, *চর্যাপদের* কবি যখন গেয়ে ওঠেন: 'বাজ নাব পাড়ি পউআ খাল বাহিউ/অদ্বয়বঙ্গালে দেশ লুড়িউ'। তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'অদ্বয়বঙ্গাল' তথা 'অখণ্ড' তথা সমগ্র বাংলাদেশের ভূখণ্ডগত স্বরূপের পরিচয়, যার বহু নদীর মধ্যে সবচেয়ে গৌরব নিয়ে বহমান রয়েছে প্রমত্তা পদ্মানদী, কিন্তু তা যখন অতিক্রম করে দস্যুরা প্রিয় মাতৃভূমিকে লুট করে প্রমত্তা নদীটি কবির চোখে নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি খালে পর্যবেশিত হয়।

আবার যখন *চর্যাপদের* কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়— 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভৈলী/নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী' তখন প্রায় দেড় সহস্র বছর আগের যে বাঙালিকে চিহ্নিত করা যায় সে তো নিতান্ত নিগৃহীত, অপমানিত, লাঞ্ছিত; তার নিজের ঘরের স্ত্রীকে চণ্ডালেরা নিয়ে যায়। অসহায় বাঙালির সেই সকরুণ চিৎকার ও বেদনার গান শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে বর্তমানকালের বাঙালিদের মর্মাহত ও বেদনার্ত করে বৈকি।

চর্যাপদের সাধক কবিদের বজ্রসাধনার গুরু বজ্রকুল কখন যে 'বাজিল' ও 'বাজুল' নাম ধারণ করেছে এবং কালক্রমে 'বাউল সাধকে' পর্যবেশিত হয়েছে তার আদিমূল এখন আর আমরা কেউ খুঁজতে তৎপর হই না। কিন্তু *চর্যাপদের* গানগুলো আজকের সাধকদের কণ্ঠে শুনতে শুনতে আমরা দ্রুতই আদিবাউলের সাধনসংগীত তথা *চর্যাপদের* বাণীর সাথে ফকির লালন সাঁইসহ অপরাপর সাধকদের বাণীর সংযোগসূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। *চর্যাপদের* কবি লুঈপা যেখানে শরীরকে গাছের সাথে তুলনা করেন, সেখানে একই মানবদেহকে ফকির লালন সাঁই 'খাঁচা' অথবা শাহ আবদুল করিম 'গাড়ি'র সাথে তুলনা করেন। কিন্তু দেহসাধনার মূল সাধনসূত্র সহস্রাধিক বছর ধরে একই রূপে বহমান রয়েছে। শুধু তাই *চর্যাপদের* মধ্যেই বাংলাদেশের বিয়ের গানের আদিসূত্র লভ্য। *চর্যাপদের* ১৯ সংখ্যক পদে কাহ্নু ও ডোম্বীর বিবাহ যাত্রার বর্ণনা আছে। এতে দুন্দুভি, পটহ, মাদল,

করঙও, কশাল প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়ে যে বিবাহ যাত্রার বর্ণনা আছে তাকে মূলত বিয়ের গান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। গানটি যখন সুনামগঞ্জের সাধকশিল্পী ধামাইল গানের সুর-তালের আদর্শে, অথবা পটুয়াখালীর সাধকশিল্পী দক্ষিণবঙ্গের বিয়ের গানের সুরে পরিবেশন করেন তখন তা সমকালীন ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি গ্রহণ করে।

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের ঐতিহ্যিক পরিচয়ের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ হয়ে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র গীতি-নাট্য-নৃত্য রূপ যেমন বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন শিল্পীর সৃষ্টিশীল উদ্যোগে নানা রূপে বহমান রয়েছে, তেমন তার আখ্যানসূত্রের সাথে পরবর্তীকালে চৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তিরস মিশ্রিত জীবনী *কৃষ্ণলীলা*র মহিমা অর্জন করেছে। পাশাপাশি পৌরাণিক চরিত্র মনসা এবং বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের আখ্যান পদ্মাপুরাণ গান, বেহুলার নাচাড়ি, পদ্মার নাচন, ভাসান যাত্রা, রয়ানি, মনসামঙ্গল প্রভৃতি নামে বিচিত্র আঙ্গিকে পরিবেশিত হচ্ছে। একই ঘটনা *রামায়ণ*, *মহাভারত* থেকে শুরু করে আলাওলের *সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, কারবালার ইতিহাসনির্ভর বিভিন্ন কবির রচিত *জঙ্গনামা*, *জারিজঙ্গনামা* প্রভৃতির বিচিত্র ধরনের গীত, নৃত্য ও নাট্যিক পরিবেশনাতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। এছাড়া, লৌকিক ইসলাম ও হিন্দু-মুসলিমের সমন্বয়জাত পৌরাণিক আখ্যান *গাজীকালু-চম্পাবতী*, *বনবিবি*, *সত্যপীরের পুথি* নির্ভর বিচিত্র কৃত্যাচার, সংগীত, নাট্য প্রভৃতির বিস্তার বহুমাত্রিক বাংলাদেশের সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির বর্ণিল প্রকাশ ঘটায়। শুধু কি তাই! বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মতুয়া, বৈষ্ণব, নাথ সম্প্রদায়, বাউল-ফকির প্রভৃতি ধর্ম ও মতাদর্শের ধারকবাহকগণ বৌদ্ধ কীর্তন, বুদ্ধ নাটক, খ্রিষ্টীয় কীর্তন, খ্রিষ্টীয় নাট্য, হরিসংগীত, মাতমনৃত্য, ডংকা বাদন, পদাবলি কীর্তন, রামলীলা, যোগীর গান, বাউল-ফকিরি গান, গোষ্ঠ গান, দৈন্য গান প্রভৃতি শিল্পকলা পরিবেশনের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন। বাংলাদেশের মানুষের যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীলতার চিরায়ত পরিচয় নিয়ে প্রশ্নোত্তরধর্মী কবিগান ও বিচারগান বিচিত্র পালা রাতের পর রাত মানুষকে মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে চলেছে। সুফিসাধকদের মাজার প্রাঙ্গণ থেকে সনাতন, বৈষ্ণব, মতুয়া প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ ও গৃহাঙ্গণে বিচারের গানের আসর ও কবিগানের আসর অদ্যাবধি চেতনার আলোকধারাকে উজ্জ্বলতা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া, খ্রিষ্টানদের গির্জা, বৌদ্ধদের বিহার বা বৌদ্ধমন্দির, বাউল-ফকির ও সাধকদের আখড়াবাড়ি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপময় ঐশ্বর্য শুধু সমকালীন শিল্পের প্রকাশ হিসেবে বিবেচ্য নয়, তার সাথে শত শত বছরের ইতিহাস, বিবর্তনের রূপরেখা ধৃত রয়েছে।

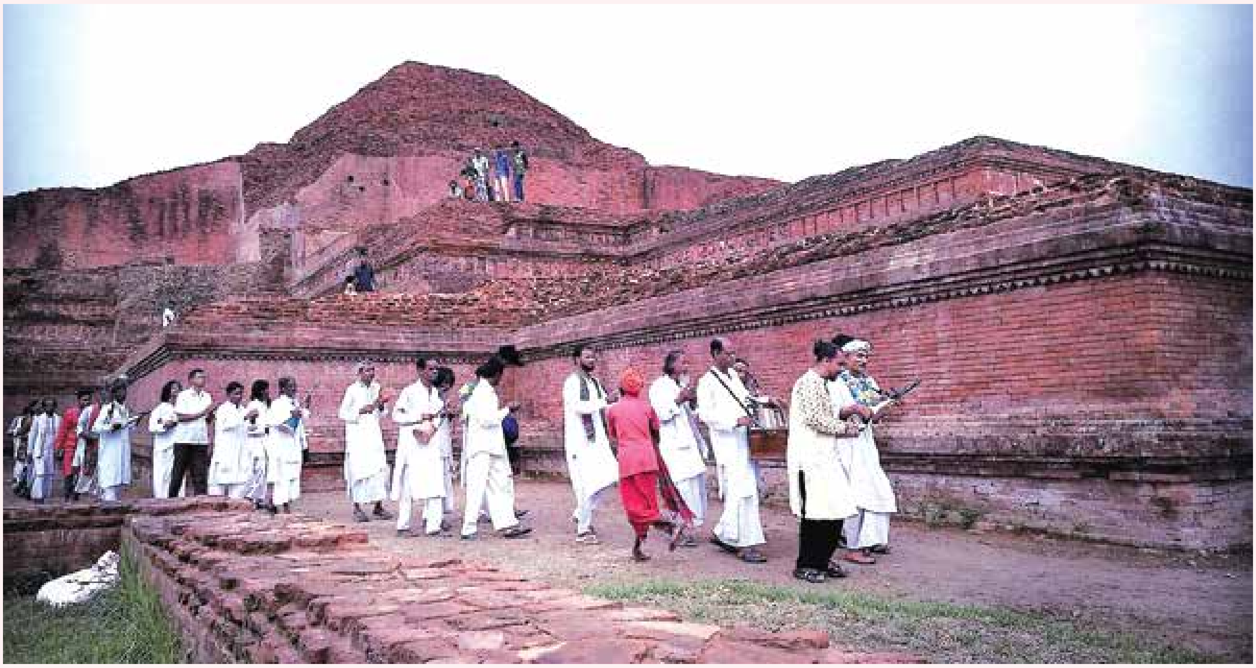

বাঙালিদের পাশাপাশি সমতল, অসমতল, অরণ্যচারী, পাহাড়ি ও সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসী বিচিত্র নৃগোষ্ঠী অথবা ভ্রাম্যমাণ বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া জনগোষ্ঠী নিজ নিজ গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা এবং কৃত্য পালনের মাধ্যমে বিচিত্র ধরনের বাদ্যযন্ত্র, সংগীত, নৃত্য, নাট্যের সীমাহীন বৈচিত্র্যকে ধরে রেখেছে। এমনকি অনেক গোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবেই নিজ নিজ কৃষি ব্যবস্থা, বস্ত্রবুনন কৌশল, উৎসব উদ্‌যাপনের মতো বর্ণিল সংস্কৃতি সুরক্ষা করে আসছে।

এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল-ফকিরি, মুর্শিদি, মারফতি, জারি-সারি, মাইজভাণ্ডারি প্রভৃতি গানের ঐতিহ্যের জনপ্রিয়তার আড়ালে রয়ে গেছে ঝাপান গান, ষাটমার গান, কুশান গান, ধুয়াগান, ত্রিনাথের গান প্রভৃতির বিলুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এমনকি পুথিপাঠের লৌকিক আসর,

আঞ্চলিক গানের সমৃদ্ধ ধারার প্রাণরসায়ন লোকচক্ষুর তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন অঞ্চলে ভালোবাসা ও আবেগের রসসঞ্চারে বিকশিত হয়ে চলেছে। একই সাথে *মৈমনসিংহ-গীতিকার* লৌকিক আখ্যানগুলো ‘কিচ্ছা’, ‘কিচ্ছাগান’ বা ‘পালাগান’ নামে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে পরিবেশিত হয়ে চলেছে। *মৈমনসিংহ-গীতিকার* অসামান্য পালাকার ও নারী কবি চন্দ্রাবতী পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। তাঁর রচিত *রামায়ণ* অনূদিত হয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণার অংশ হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর রচিত *মলুয়া পালা* অনন্য শিল্পগুণে প্রশংসিত হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, চন্দ্রাবতীর জীবনীও মধ্যযুগের লৌকিক কিচ্ছাপালায় রূপান্তরিত হয়েছে, যা আজও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিচ্ছাকারগণ পরিবেশন করে চলেছেন। এ ধরনের কিচ্ছাদারদেরই একজন ইসলামউদ্দিন পালাকার এবছর (২০২৬ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথমবারের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত একুশে পদক অর্জন করেছেন।

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের সংগীত, নৃত্য, নাট্যের সাথে রয়েছে বিচিত্র উৎসব, মেলা, পার্বণের গভীর সম্পর্ক। বাংলা নববর্ষ থেকে শুরু করে বাংলা ঋতু, মাসের উপর নির্ভর করে কিছু উৎসব, মেলা ও পার্বণের যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি চন্দ্রমাস তথা হিজরি বর্ষপঞ্জির হিসেবে কিছু কৃত্যাচারমূলক উৎসব, পার্বণ ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। এমনকি খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জির হিসেবেও এদেশের বিচিত্র উৎসব, পার্বণ, মেলার সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করা যায়। কথায় আছে– ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’। এটাই যেন বৈচিত্র্যের বাংলাদেশের ঐতিহ্যের আসল বিধান। ঋতুভেদে বাংলাদেশের প্রকৃতির যেমন রূপ বদল ঘটে তেমনি উৎসব, মেলা, পার্বণেরও রূপ বদল হয়। গ্রীষ্মে নববর্ষ ও হালখাতা, বর্ষায় রথযাত্রা ও মনসা পূজা, শরতে দুর্গাপূজা, হেমন্তে নবান্ন, শীতে পৌষমেলা ও পৌষ সংক্রান্তি এবং বসন্তে বাসন্তী পূজা ও চৈত্র সংক্রান্তি প্রধান উৎসব।

বাংলা ঋতুচক্রের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীদের মধ্যেও বিভিন্ন উৎসব ও মেলার ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। নৃগোষ্ঠীদের উৎসব বা পার্বণ আয়োজনের সাথে কৃষিসংস্কৃতি ও প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীরা বাংলা বর্ষপঞ্জির অনুসরণে বিচিত্র উপায়ে বর্ষবরণ করে থাকে। বিশেষ করে বৈশাখ মাসে বিজু, বৈসু ও সাংগ্রাই উদ্‌যাপন করে থাকে। মূলত পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমারা বছরের শেষে পুরানো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করতে বিজু/বৈসু/সাংগ্রাই প্রভৃতি উৎসব পালন করে। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে তারা ঐতিহ্যবাহী খাবার ও ‘সাংগ্রাই’ বা পানি ছিটানোর উৎসব আয়োজন করে।

পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীদের পাশাপাশি বৈশাখ মাসে সমতলের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীরা গোষ্ঠী বিষু/বিহু নামে নিজস্ব ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিতে বর্ষবরণ করে থাকে। বর্ষবরণের উৎসবই শুধু নয়, বিচিত্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা ঐতিহ্যগতভাবে অন্যান্য ঋতুতেও কিছু উৎসব আয়োজন করে। যেমন শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে তথা কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জয়পুরহাটসহ উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মানুষ সহরায় উৎসব ও সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করে। নৃগোষ্ঠীর এই উৎসব গ্রামীণ পরিবেশের পাশাপাশি নগরজীবনেও প্রবেশ করেছে। বিজু-বৈসু-সাংগ্রাই-বিহু-বিষু-সাংক্রাণ মেলার মতো ঐতিহ্যগত উৎসব বৈশাখ মাসে রাজধানীতে পাহাড়ি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সমবায়ে প্রায়শ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এসব উৎসব ও মেলার মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভিন্নতর জীবনধারা প্রদর্শন করে থাকে।

হিজরি বর্ষপঞ্জি মূলত চন্দ্রনির্ভর। চন্দ্র মাসের সূচনা ঘটে মহর্‌রম মাসে। এই মাসের দশম দিন অর্থাৎ 'আশুরা' উপলক্ষ্যে কারবালার ট্র্যাজেডি এবং ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদতের স্মরণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারি-মর্সিয়া, মাতম, তাজিয়া মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মহর্‌রমের সঙ্গে শোকের গভীর সম্পর্ক থাকলেও তা মহর্‌রমকেন্দ্রিক নানা ধরনের আয়োজন, উৎসব ও মেলার আমেজে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই একে অনেকটা শোক-উৎসব বলা যেতে পারে। কেননা, কারবালার যুদ্ধের স্মরণে মহর্‌রম অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাদ্য বাজানো, অস্ত্র প্রদর্শন ও জারি-মর্সিয়ার সাথে মাতম-নৃত্য প্রত্যক্ষ করা যায়। পাশাপাশি লোকখাদ্যের দোকান থেকে শুরু করে খেলনা, গৃহসামগ্রী প্রভৃতির পসরার বিস্তার দেখা যায় মহর্‌রমের কৃত্যানুষ্ঠানকেন্দ্রিক বিভিন্ন মোকাম, ইমামবাড়া বা আস্তানার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। হিজরি বর্ষপঞ্জির হিসাবে অন্যান্য প্রধান উৎসবগুলোর মধ্যে থাকে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, পবিত্র শবে বরাত, শবে কদর ও ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)। বাংলাদেশে এসব উৎসবের সঙ্গে নানা লোকজ মেলা, দোয়া মাহফিল ও খাবারের আয়োজন যুক্ত থাকে।

অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে বেশ কিছু উৎসব-পার্বণের ঐতিহ্য প্রচলিত রয়েছে। এরমধ্যে বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব ও পার্বণগুলো মূলত গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো বুদ্ধ পূর্ণিমা। এছাড়া প্রবারণা পূর্ণিমা (ফানুস উৎসব), মাঘী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান এবং পরিনির্বাণ দিবস অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। বৌদ্ধ পার্বণে বুদ্ধপূজা, শীল গ্রহণ, বিহারে দান, ফানুস ওড়ানো এবং বিশেষ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শান্তি ও মৈত্রীর বার্তা প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব হলো ২৫শে ডিসেম্বর উদ্‌যাপিত বড়োদিন (Christmas)। বাংলাদেশে বড়োদিন উপলক্ষ্যে পিঠা বানানো, নতুন পোশাক পরিধান এবং ঘরে ঘরে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। ঢাকা ছাড়াও বরিশাল, খুলনা, পাবনা এবং গাজীপুরের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় উৎসবের আমেজ বেশি থাকে। অনেক অঞ্চলে এ উপলক্ষ্যে খ্রিষ্টীয় নাট্যপালা, খ্রিষ্টীয় কীর্তন প্রভৃতি পরিবেশিত হয়ে থাকে। এছাড়াও ইস্টার সানডে, গুড ফ্রাইডে এবং নববর্ষসহ বেশ কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব তারা পালন করেন, যা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। ইংরেজি নতুন বছর (১লা জানুয়ারি) খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে।

বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান ধর্মগোষ্ঠী হচ্ছে মতুয়া সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব হলো শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বারুণী স্নান ও মেলা। এটিই মতুয়াদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। প্রতিবছর বাংলা চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে এই বারুণী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। গোপালগঞ্জের শ্রীধাম ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়িতে এই তিথিতে অগণিত ভক্তের সমাগম ঘটে। তারা ডংকা, শিংগা, কাশায় ধ্বনি তুলে মাতম-নাচ, হরিসংকীর্তন প্রভৃতি পরিবেশন করে থাকেন। এছাড়া মতুয়া সম্প্রদায়ের ভক্তরা সুন্দরবনের অভ্যন্তরে দুবলার চরে প্রতিবছর রাসপূর্ণিমার তিথিতে রাসমেলা ও পুণ্যস্নান করে থাকে। এর বাইরেও কয়েক সহস্রাধিক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ঐতিহ্যের প্রবহমান পথ দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহমান রয়েছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ঐতিহ্যিক চর্চার এই ফল্গুধারার প্রকাশ এতটাই গভীরে বহমান যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত ও মূলধারার গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিসীমা সেই গভীরে প্রসারিত দিগন্তে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, ঐতিহ্যপ্রেমী, ইতিহাসের সঙ্গে নিবিষ্ট সংযোগ রক্ষাকারীদের সন্ধানে বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের বর্ণিল রূপরেখা সতত ভাস্বর থাকে।

ড. সাইমন জাকারিয়া: লোকসংস্কৃতি গবেষক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার এবং বাংলা একাডেমির উপপরিচালক, dr.zakariasaymon@gmail.com

বন্ধ টেক্সটাইল মিল চালুর আশা

বন্ধ থাকা শিল্পকারখানা পুনরায় চালু করা সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের একটি লক্ষ্য। এলক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ টেক্সটাইল ও পাটকল চালুর উদ্যোগ নিয়ে দ্রুততার সাথে কাজ করছে। ১২ই এপ্রিল ২০২৬ দিনাজপুর এবং নীলফামারীতে টেক্সটাইল মিল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী দেশের বন্ধ থাকা জুট ও টেক্সটাইল মিলগুলো পুনরায় চালু করার উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে। নীলফামারীর দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল নিয়ে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র করা হয়েছে, আরো ভালো বিনিয়োগকারীও পাওয়া যাচ্ছে। আমরা আশা করছি, দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই মিলটি পুনরায় চালু হবে এবং স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে। দিনাজপুরের টেক্সটাইল মিলও খুব দ্রুতই আবার চালু করা হবে।

পরিদর্শনের সময় নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আল ফারুক আব্দুল লতিফ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ের সচিব বিলকিস জাহান রিমি, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়জুল ইসলাম, বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস কর্পোরেশনের (বিটিএমসি) পরিচালক এইচ এম নুরুল ইসলাম ও মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা কাজী ফিরোজ হোসেন ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: সাবিহা শিমুল

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসের তাৎপর্য ও বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্র

মো. মামুন অর রশিদ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে চলচ্চিত্র এক অনন্য আবিষ্কার। চলচ্চিত্র বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুমাত্রিক মাধ্যম। চলচ্চিত্র প্রথমত একটি শিল্প মাধ্যম, দ্বিতীয়ত বিনোদন মাধ্যম এবং তৃতীয়ত একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। চলচ্চিত্র সমাজ, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। চলচ্চিত্র একটি জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের রয়েছে বহুমুখী ও জটিল চরিত্র। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি সমাজের বাস্তব চিত্র উঠে আসে। এই মাধ্যমটি খুব সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে, সামাজিকীকরণেও জোরালো ভূমিকা রাখে।

ইতিহাসের প্রারম্ভে কেবল বিনোদনের নিখাদ উৎস হিসেবে বিবেচিত হলেও কালক্রমে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর এ আবিষ্কারটি মানুষের মনন, সৃজনশীলতা এবং মানবিকবোধ গঠনে একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। চলচ্চিত্র হচ্ছে আমাদের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিলনভূমি। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল মানুষের চিন্তা ও কর্ম বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। চলচ্চিত্র অতি সহজেই একটি জাতিকে অন্য একটি জাতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সভ্যতার বিকাশেও রয়েছে চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

একটি ভালো চলচ্চিত্র আমাদের শুধু বিনোদন দেয় না; এটি আমাদের কাঁদায়, হাসায় ও ভাবায়। কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস জোগায়, আবার কখনো ভালোবাসার মানে নতুন করে বুঝতে শেখায়। চলমান ছবির ভেতর দিয়ে যখন আমরা একটি গল্প দেখি, তখন আমরা আর নিছক দর্শক থাকি না– অজান্তেই সেই গল্পের অংশ হয়ে উঠি। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রের আনন্দে আমরা হাসি, আবার তাদের বেদনায় আমরা অশ্রুসিক্ত হই। এটাই চলচ্চিত্রের প্রকৃত শক্তি। একটি চলচ্চিত্র সরাসরি মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই দিনটি শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস, সংগ্রাম, সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতীক। 'আমাদের চলচ্চিত্র, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য'– এই প্রতিপাদ্যে এ বছরের ৩রা এপ্রিল দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে (এফডিসি) দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়েছে।

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসের সঙ্গে এফডিসি প্রতিষ্ঠার একটি যোগসূত্র রয়েছে। ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন' বিল পাস হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (ইপিএফডিসি)। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন', যা এফডিসি নামে বহুল পরিচিত। এফডিসির জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতেই ৩রা এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এফডিসি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই ভূখণ্ডে চলচ্চিত্র নির্মাণ একটি প্রাতিষ্ঠানিক

ভিত্তি পায় এবং বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিকাশে এফডিসির রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস আমাদের সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং চলচ্চিত্রের উন্নয়নে ভাবতে শেখায়।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা, গ্রামীণ জীবনের সরলতা, সামাজিক বৈষম্যের তীক্ষ্ণ বাস্তবতা, প্রেমের কোমলতা এবং মানবিকতার গভীর বোধ– সবই শক্তিশালীভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো শুধু ইতিহাস বলে না; এগুলো আমাদের ভেতরের দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলে, নতুন প্রজন্মকে অতীতের সঙ্গে পরিচিত করে এবং আত্মপরিচয়ের বোধকে দৃঢ় করে।

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি সম্মান জানানোর একটি মাধ্যম। দিবসটি উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্রের শিল্পী, পরিচালক, কলাকুশলী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা। তাদের নিরলস পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সৃজনশীলতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প। আলো-ছায়ার আড়ালে তাঁদের ঘাম আর শ্রমই তৈরি করে একেকটি জীবন্ত গল্প।

তবে এই উদ্‌যাপনের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে কিছু প্রশ্ন। আমাদের চলচ্চিত্র কি তার মান ধরে রাখতে পারছে? আমরা কি নিয়মিত আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উপহার দিতে পারছি? নতুন প্রজন্ম কি যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে এই শিল্পে আসছে? এসব প্রশ্ন আমাদের আত্মসমালোচনার দিকে ঠেলে দেয়, আর সেখান থেকেই শুরু হতে পারে পরিবর্তনের পথচলা।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণ অনেক সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, আধুনিক ক্যামেরা ও সম্পাদনা-প্রযুক্তি নির্মাণ প্রক্রিয়াকে গতিশীল করেছে। কিন্তু সহজলভ্যতা মানেই মানোন্নয়ন নয়। সৃজনশীলতা, গল্পের গভীরতা এবং নির্মাণশৈলীর উৎকর্ষ এখনো বড়ো চ্যালেঞ্জ। এই বাস্তবতায় জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়– শুধু সংখ্যা নয়, গুণগত উৎকর্ষই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য।

চলচ্চিত্র আমাদের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম। আমাদের ভাষা, ঐতিহ্য, পোশাক, জীবনধারা, লোকজ সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ– সবই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বৈশ্বিক দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এই অর্থে চলচ্চিত্র শুধু শিল্প নয়, এটি সাংস্কৃতিক দূত হিসেবেও কাজ করে।

বিশ্বায়নের এই সময়ে, যখন বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে, তখন নিজস্ব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা এবং তা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। এ দায়িত্ব পালনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম, আর জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস আমাদের সেই দায়িত্বের কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশ্বায়নের এই যুগে যখন বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে, তখন নিজস্ব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

চলচ্চিত্র আসলে একটি জাতির স্বপ্ন, সংগ্রাম ও পরিচয়ের আয়না। তাই জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস আমাদের কাছে কেবল উদ্‌যাপনের দিন নয়, এটি আত্মবিশ্লেষণ, অঙ্গীকার এবং নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রেরণার দিন।

২০১২ সালে সরকার চলচ্চিত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'শিল্প' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ৩রা এপ্রিলকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এই স্বীকৃতি শুধু প্রতীকী নয়; এর মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য তৈরি হয়েছে একটি বাস্তবভিত্তিক সহায়ক পরিবেশ। বিনিয়োগবান্ধব নীতি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, শিল্পী ও কলাকুশলীদের দক্ষতা উন্নয়ন– সবকিছুর পথ আরও সুগম হয়েছে। পাশাপাশি, চলচ্চিত্র নির্মাণসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক ছাড় এবং নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণেও আর্থিক সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা চলচ্চিত্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প খাতে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ফলে এই খাতের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে নতুন সম্ভাবনার দ্বার, যা ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র শিল্পকে আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সহায়তা করবে।

চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো প্রামাণ্যচিত্র। প্রামাণ্যচিত্রে কোনো বিষয়কে বিস্তারিত, গভীর ও তথ্যসমৃদ্ধভাবে তুলে ধরা হয়। কোনো নাটক বা কাহিনি যদি তথ্য ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়, তাও প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। প্রামাণ্যচিত্র কেবল তথ্য দেয় না, এটি দর্শককে ভাবতে শেখায় এবং সচেতনতা তৈরি করে। চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ এই শাখাটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে এ ভূখণ্ডে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্মিত প্রথম প্রামাণ্যচিত্র হলো 'ইন আওয়ার মিডস্ট'। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান সফর ছিল এই প্রামাণ্যচিত্রের বিষয়বস্তু। বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি– এই তিন ভাষায় প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মিত হয়। এরপর ১৯৫৪ সালে সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় প্রামাণ্যচিত্র 'সালামত' নির্মিত হয়। চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের মতে, 'সালামত' হচ্ছে এদেশের ভূখণ্ড থেকে নির্মিত প্রথম সফল প্রামাণ্যচিত্র। সরকারের জনসংযোগ দপ্তরের অধীনে ১৯৫৫ সালের ১৫ই জুন চলচ্চিত্র বিভাগের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এবং একই সঙ্গে একটি নতুন স্টুডিও নির্মাণ করা হয়।

এরপর চলচ্চিত্র বিভাগের তত্ত্বাবধানে ধারাবাহিকভাবে প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়। ১৯৬৫ সালে ঢাকায় আঞ্চলিক ফিল্ম ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যাপকহারে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি ফিল্ম ইউনিট স্থাপন করে। এর ফলে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। এই ইউনিট থেকে ১৯৭০ সালে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনীর ওপর 'বিদ্রোহী কবি' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে জহির রায়হান এবং তাঁর কলকাতার কিছু শুভানুধ্যায়ী মিলে নির্মাণ করেন প্রামাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'। এই প্রামাণ্যচিত্রকে বলা হয় বাংলাদেশের প্রথম সফল প্রামাণ্যচিত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে এই প্রামাণ্যচিত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদচিত্র নির্মাণে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নবসৃষ্ট প্রকাশনা বিভাগ ও চলচ্চিত্র বিভাগকে একীভূত করে ১৯৭৬ সালে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে এর নামকরণ করা হয় 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর'।

১৯৭২ সালে তৎকালীন চলচ্চিত্র বিভাগ (বর্তমান নাম: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর) 'দেশে আগমন' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্র বিভাগ প্রায় ২৫টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে। এসব প্রামাণ্যচিত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় উন্নয়নকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে। সত্তরের দশকে চলচ্চিত্র বিভাগ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী, জাতীয় দিবস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক প্রতিরোধ, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সফর, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, খাল খনন, খাদ্য নিরাপত্তা, পাটচাষ, জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে ডিএফপি আরও বিস্তৃতভাবে কাজ শুরু করে। এ সময় প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা, যুব উন্নয়ন, নির্বাচনি আচরণবিধি ও ভোটদান পদ্ধতি, সামাজিক বনায়ন, কৃষি আধুনিকীকরণ, যৌতুক প্রতিরোধ, শিশুদের মানসিক বিকাশ, বাংলাদেশের সার কারখানা, বৃক্ষরোপণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রত্নতত্ত্ব, বস্ত্রশিল্প, মৎস্যসম্পদ, কুটিরশিল্প, আদমশুমারি (জনশুমারি) প্রভৃতি বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়।

গত দুই দশকে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে সমসাময়িক বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত দুই দশকে ডিএফপিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, কারিগরি শিক্ষা, গুজব মোকাবিলা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রতিরোধ, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের প্রতি কর্তব্য, নাগরিক দায়িত্ববোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশুশ্রম প্রতিরোধ, সরকারি আইনি সহায়তা, নিরাপদ পানি, টেকসই উন্নয়ন, মাদক ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, বইপড়ার অভ্যাস গঠন, শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা, অটিজম, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধসহ আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এসব প্রামাণ্যচিত্র জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বর্তমানে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে গবেষণা ও সৃজনশীলতার সমন্বয় আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। প্রামাণ্যচিত্রে সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতা, পরিবেশগত সংকট, প্রান্তিক মানুষের জীবন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

আশার কথা হলো, ডিএফপির পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ নিয়মিতভাবে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করছে। এছাড়া, বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগেও মানসম্পন্ন প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হচ্ছে। এসব প্রামাণ্যচিত্র দর্শকদের কাছে সমাদৃত হচ্ছে। প্রামাণ্যচিত্রের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তরুণ নির্মাতাসহ অনেকেই দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এর ফলে প্রামাণ্যচিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী হচ্ছে।

চলচ্চিত্র মানুষের অনুভূতি, সমাজ ও সময়ের গল্প বলে। প্রামাণ্যচিত্র আবার এই গল্পকে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তবতার আলোয় উপস্থাপন করে, যা ইতিহাস ও সমাজের নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে ওঠে। জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস সেই গল্প বলার শিল্পকে স্মরণ ও মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। সম্মিলিতভাবে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত প্রতিটি উপাদান আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও পরিচয়ের ধারাকে আরও সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করে তুলবে– এমনটাই প্রত্যাশা।

মো. মামুন অর রশিদ: উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

রাত তখন প্রায় ২টা। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ডিউটি করছি। হঠাৎ নার্স এসে বলল, 'স্যার, একটা বাচ্চা এসেছে, শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমতো।' দ্রুত গিয়ে দেখি, ৮ মাস বয়সি শিশু, বুক দ্রুত ওঠানামা করছে, ঠোঁট নীলচে। মা অসহায় কণ্ঠে বললেন, 'ডাক্তার, আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান'। স্টেথোস্কোপে বুকের শব্দ শুনেই বোঝা গেল, গুরুতর শ্বাসকষ্ট, সম্ভবত নিউমোনিয়া। অক্সিজেন, নেবুলাইজেশন, অ্যান্টিবায়োটিক– সবকিছু শুরু করা হলো। প্রথম এক ঘণ্টা যেন সময় থেমে ছিল। ধীরে ধীরে শিশুটির শ্বাস স্বাভাবিক হতে লাগল। মায়ের চোখে জল, কিন্তু সেই জলে এখন স্বস্তির ছোঁয়া। সেই মুহূর্তে মনে হলো, একটি শ্বাস শুধু একটি জীবনের নয়, একটি পরিবারের, একটি সমাজের আশার প্রতীক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস: ইতিহাস থেকে বর্তমান

প্রতিবছর ৭ই এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস বা World Health Day, যা World Health Organization (WHO) প্রতিষ্ঠার দিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৪৮ সালে WHO প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্যকে একটি বৈশ্বিক অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট থিমের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের থিম 'সবার জন্য স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানের সঙ্গে দাঁড়াও'। এর মাধ্যমে আহ্বান জানানো হচ্ছে– জনগণ, সরকার, স্বাস্থ্যকর্মী ও বিজ্ঞানীদের মিলিত হয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করতে হবে এবং একটি স্বাস্থ্যবান, নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। কুসংস্কারভিত্তিক চিকিৎসা অথবা চিকিৎসক নন এমন কারো থেকে চিকিৎসা নেওয়া পরিহার করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারী সকলকেই নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হবে। চিকিৎসা একটি মৌলিক অধিকার, তাই সকলের এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকেও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই ধারণা থেকেই এসেছে Universal Health Coverage– যেখানে প্রত্যেক মানুষ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পাবে, আর্থিক কষ্ট ছাড়াই।

স্বাস্থ্য শুধু– 'রোগ নেই'– এই ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এটি একটি বহুমাত্রিক কাঠামো:

- শারীরিক স্বাস্থ্য– রোগমুক্ত থাকা, পুষ্টি, ফিটনেস।
- মানসিক স্বাস্থ্য– চাপ মোকাবিলা, আবেগের ভারসাম্য।
- সামাজিক স্বাস্থ্য– সম্পর্ক, নিরাপত্তা, সামাজিক সমর্থন।
- পরিবেশগত স্বাস্থ্য– পরিষ্কার পানি, বায়ু, নিরাপদ বাসস্থান।

অর্থাৎ, স্বাস্থ্য একটি interconnected system যেখানে প্রতিটি অংশ অন্যটির সাথে সম্পর্কিত।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্তরভিত্তিক কাঠামো একটি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে কাজ করে–

Primary Level (প্রাথমিক স্তর)

- কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন সাব-সেন্টার
- টিকাদান, মাতৃসেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি।

এখানে রোগ প্রতিরোধই মূল লক্ষ্য। এই স্তরে সাধারণত চিকিৎসা সহকারীগণ কাজ করেন।

Secondary Level (মাধ্যমিক স্তর)

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল
- সাধারণ রোগের চিকিৎসা, কিছু বিশেষায়িত সেবা ইত্যাদি।

Tertiary Level (তৃতীয় স্তর)

- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট
- জটিল রোগ, ICU, advanced care ইত্যাদি।

এই তিনটি স্তর সমন্বিতভাবে ও সুন্দর রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করলেই একটি কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

স্বাস্থ্য খাতের স্টেকহোল্ডার

স্বাস্থ্যের বিষয় বলতে অনেকে শুধু চিকিৎসক বা হাসপাতাল মনে করেন। কিন্তু বিষয়টি এতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে পরিচ্ছন্নকর্মী, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, পরিবেশ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সরকার এমনকি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ও এর সাথে জড়িত।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী

ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, চিকিৎসা সহকারী, মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রমুখ সরাসরি সেবা প্রদান করে থাকেন। প্রফেসরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসকগণ মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি এমবিবিএস ও বিডিএস শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে থাকেন। শুধু এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রিধারীগণই আইন অনুযায়ী নামের আগে ডাক্তার লিখতে পারেন। বাকিরা চিকিৎসা সহকারী। এছাড়া অ্যালোপ্যাথি বাদে অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শীগণকে Alternative Medicine-এর আওতায় ধরা হয়।

সরকার

মন্ত্রী, সচিব প্রমুখ নীতি নির্ধারণ, অবকাঠামো, অর্থায়ন ইত্যাদি নিশ্চিত করে থাকেন। বিভাগীয় পরিচালক, সিভিল সার্জন (জেলা পর্যায়ে), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হাসপাতাল পরিচালক প্রমুখ এসব বাস্তবায়ন করেন।

আন্তর্জাতিক সংস্থা

WHO, UNICEF ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও গাইডলাইন দিয়ে থাকে।

বেসরকারি খাত

প্রাইভেট হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যাদি সেবার পরিসর বাড়ায়।

জনগণ

জনসচেতনতা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ইত্যাদি বিষয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। অর্থাৎ, স্বাস্থ্য একটি shared responsibility. Public Private Partnership- এর গুরুত্ব এখানে অপরিসীম।

বাংলাদেশের সাফল্য

সীমিত সম্পদের মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। টিকাদানে বিশ্ব স্বীকৃতি, মাতৃমৃত্যু হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল প্রভৃতি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা এখন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

চ্যালেঞ্জঃ সামনে যে পথ

তবে কিছু বড়ো চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। যেমন গ্রামীণ এলাকায় বিশেষজ্ঞের অভাব, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের চাপ, অসংক্রামক রোগের বিস্তার, মানসিক স্বাস্থ্য অবহেলা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জনসচেতনতার অভাব ইত্যাদি। এগুলো মোকাবিলায় প্রয়োজন উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বস্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে। চিকিৎসকসহ সকলকে আরো দায়িত্বশীল এবং সহানুভূতিশীল হয়ে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বাড়াতে হবে, যাতে অবকাঠামো, প্রযুক্তি, পর্যাপ্ত লোকবল, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করা যায়।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যঃ ভবিষ্যতের চাবিকাঠি

চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ বেশি কার্যকর। এজন্য সুষম খাদ্য খেতে হবে। খাদ্যে ভেজাল রোধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কাজ খুবই প্রশংসা পেয়েছে, এটি অব্যাহত রাখতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। ধূমপান, তামাক, অতিরিক্ত লবণ, চিনি, তেল, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বর্জন করতে হবে। সময়মতো টিকা নিতে হবে। তাছাড়া নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে, তাহলে অনেক বড়ো বড়ো রোগ আগেই ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে। 'Prevention is better than cure' শুধু প্রবাদ নয়—এটি আসলেই একটি বাস্তব কৌশল।

আমরা চিকিৎসকরা প্রতিদিন দেখি, একটি প্রেসক্রিপশনের পেছনে থাকে একটি গল্প। কখনো দারিদ্র্য, কখনো অজ্ঞতা, কখনো অবহেলা এই সবকিছু মিলেই তৈরি হয় একটি রোগ। তাই চিকিৎসা শুধু ওষুধ নয়– এটি শিক্ষা, সচেতনতা এবং সহানুভূতির সমন্বয়। শুরুতে বলা সেই শিশুটি এখন সুস্থ। কিন্তু এমন হাজারো শিশু আছে, যারা সময়মতো চিকিৎসা পায় না। এই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেব, অন্যকে সচেতন করব, সকলে মিলে একটি স্বাস্থ্যবান সমাজ গড়ে তুলব। কারণ একজন সুস্থ মানুষই পারে একটি শক্তিশালী জাতি গড়ে তুলতে।

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী: চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক, jafri.drmc.dmc@gmail.com

কৃষক কার্ড বিতরণ উদ্বোধন

কৃষক কার্ড বিতরণ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে ১৪ই এপ্রিল ২০২৬ এই কার্যক্রম উদ্বোধনের সময় তিনি স্থানীয় ১৫ জন কিষান-কিষানির হাতে কৃষক কার্ড ও গাছের চারা তুলে দেন। প্রথম ধাপে সারা দেশের ১০টি জেলার ১১টি উপজেলায় প্রায় ২১ হাজার ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে এই কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ, বিশেষ অতিথি রয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন (টুকু)। শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে কৃষক কার্ড বিতরণ উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে কৃষি মেলার উদ্বোধন করেন। কৃষি কার্ডের মাধ্যমে কৃষক, মৎস্যচাষি ও দুগ্ধ খামারিরা নগদ প্রণোদনা, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সেচসুবিধা, সহজ শর্তে ঋণ, কৃষিবিমাসহ মোট ১০ ধরনের বিশেষ সুবিধা পাবেন।

পেশাজীবী হিসেবে কৃষকের স্বীকৃতি প্রদান, আয় বৃদ্ধি এবং ভরতুকি বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। আগামী চার বছরে ১ কোটি ৬৫ লাখ কৃষকের হাতে এই কার্ড তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৮১ কোটি টাকা।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

গুজব, সাইবার বুলিং ও সতর্কতা

রেজা নওফল হায়দার

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়রানি করার নামই সাইবার বুলিং। এটি সামাজিক মিডিয়া, মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম, গেমিং প্ল্যাটফর্ম এবং মোবাইল ফোনে ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে যাদেরকে টার্গেট করা হয় তাদেরকে ভয় দেখানো, রাগিয়ে দেওয়া, লজ্জা দেওয়া বা বিব্রত করার জন্য বার বার এরূপ আচরণ করা হয়। সামাজিক মাধ্যমে কারো সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া বা বিব্রতকর অথবা অবমাননাকর ছবি পোস্ট করা হয়। মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্ষতিকর মেসেজ দেওয়া বা হুমকি দেওয়া হয়। অন্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে তার পক্ষে আর একজনকে ম্যাসেজ পাঠানো হয়। মুখোমুখি বুলিং এবং সাইবার বুলিং প্রায়শই একে অপরের পাশাপাশি ঘটতে পারে। তবে সাইবার বুলিং একটি ডিজিটাল পদচিহ্ন রেখে যায়। এই ডিজিটাল পদচিহ্ন এমন একটি রেকর্ড যা কার্যকর প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে এবং অপব্যবহার বন্ধে সহায়তা করতে প্রমাণ সরবরাহ করতে পারে।

অনলাইনে কেউ আপনার সাথে রসিকতা করছে, নাকি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে– কখনও কখনও এটি বলা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কখনও কখনও তারা ‘কেবল মজা করেছে’ বা ‘এটিকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নেই’– এমনটা বলে হাসাহাসি করবে। তবে যদি কষ্ট পান বা আপনি যদি মনে করেন যে, অন্যরা আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি বা তামাশা করছে, তাহলে বুঝতে হবে রসিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। যে ব্যক্তি আপনাকে নিয়ে রসিকতা করছে তাকে থামতে বলার পরেও যদি সেটা চালিয়ে যেতে থাকে এবং আপনি এতে বিরক্ত হন, তবে তা বুলিংয়ের পর্যায়ে পড়ে। এছাড়াও, যখন অনলাইনে বুলিং ঘটে, তখন এটি অপরিচিতসহ বহু মানুষের অযাচিত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। যেখানেই এটি ঘটুক না কেন, আপনি যদি এটিতে ভালো বোধ না করেন, তাহলে এটির বিরুদ্ধে আপনার সোচ্চার হওয়া উচিত।

বুলিং যখন অনলাইনে সংঘটিত হয়, তখন এমন মনে হয় যে নিজের বাড়ির ভেতরসহ সর্বত্র আপনি আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এ সময় মনে হতে পারে যে, এ থেকে আপনার পালানোর কোনো পথ নেই। এর প্রভাব দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

সামাজিক প্ল্যাটফর্মে যদি বুলিং ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে যিনি বুলিং করছেন তাকে ব্লক করে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং তাদের এই আচরণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে প্ল্যাটফর্মে জানান। সামাজিক মাধ্যম সংস্থাগুলো তাদের ব্যবহারকারীদের সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ।

কী ঘটছে তা দেখানোর জন্য সামাজিক মাধ্যমের পোস্টগুলোর টেক্সট মেসেজ এবং স্ক্রিনশট প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে। বুলিং বন্ধ করার জন্য অবশ্যই এটিকে শনাক্ত করা দরকার এবং বুলিংয়ের বিষয়টি রিপোর্ট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যদি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিপদে পড়েন, তখন দেশের পুলিশ বা জরুরি সেবা সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। আপনি যদি অনলাইনে বুলিংয়ের শিকার হন, তবে আপনাকে ডিজিটাল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ফেসবুকে আমাদের একটি গাইড বা নির্দেশিকা রয়েছে। বুলিং প্রতিরোধ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে অথবা অন্য কাউকে বুলিংয়ের শিকার হতে দেখলে কী করতে হবে সে বিষয়গুলোতে এই নির্দেশিকাটি আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ

- ডজনের বেশি নতুন সংজ্ঞা যুক্ত
- ৪টি অপরাধ অজামিনযোগ্য
- সাইবার বুলিংয়ের বিধান বাতিল
- জাতীয় সংগীত ও পতাকার অবমাননার ধারা যুক্ত

আপনি যদি মনে করেন যে আপনি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনার নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হন, তাহলে নিজে আত্মবিশ্বাসী হয়ে লড়তে হবে।

যে-কোনো ব্যক্তি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে পারেন। আপনি চেনেন এমন কারও সাথে এমনটি ঘটতে দেখলে তাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করুন।

আপনার বন্ধুটি যদি এখনও ঘটনাটি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে না চান, তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাকে সহযোগিতা করতে পারে এমন একজন বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্ককে খুঁজে দিতে সহায়তা করুন। মনে রাখবেন, বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে সাইবার বুলিংয়ের পরিণতি প্রাণঘাতী হতে পারে।

কোনো কিছু রিপোর্ট করা যে কঠিন হতে পারে সে বিষয়টি আমরা জানি। তবে কাউকে বুলিং করা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য না।

ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে ঐ সংস্থাকে। ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকে সাইবার বুলিংয়ের একটি ঘটনা রিপোর্ট করার বিষয়টি সবসময় বেনামে থাকে।

আপনি আপনার বন্ধুকে ইনস্টাগ্রামের রেসট্রিক্ট নামক একটি টুল সম্পর্কেও জানাতে পারেন। এখানে কাউকে ব্লক না করে আপনি নিজের অ্যাকাউন্টকে বিচক্ষণতার সাথে রক্ষা করতে পারবেন। যদিও বিষয়টি কিছু মানুষের কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে।

আপনি যদি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হন, নিজেকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাকে কিছু সময়ের জন্য কিছু অ্যাপ মুছে ফেলতে হতে পারে বা অফলাইনে থাকতে হতে পারে। তবে, ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা দীর্ঘমেয়াদি কোনো সমাধান নয়। আপনি তো কোনো ভুল করেননি। তাহলে কেন আপনি অসুবিধা ভোগ করবেন? যারা বুলিং করে এটি তাদেরকে ভুল সংকেতও দিতে পারে। পক্ষান্তরে এটি তাদেরকে গ্রহণযোগ্য নয় এমন আচরণ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে পারে।

নিজেদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুককে নিরাপদ ও ইতিবাচক জায়গা হিসেবে ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষজন কেবল নিরাপদ বোধ করলেই নিজেদের সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। তবে আমরা জানি, যে-কোনো ক্ষেত্রে সাইবার বুলিং অব্যাহত থাকতে পারে এবং নেতিবাচক অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে।

যেহেতু বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ টুইটারে তাদের আইডিয়া শেয়ার করে, আমরা সকলে সব বিষয়ে একমত না হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটির একটি সুবিধা হলো এই যে, আমরা সকলেই সম্মানজনক মতবিরোধ এবং আলোচনা থেকে শিখতে পারি।

কিন্তু অনেক সময়, কিছু সময়ের জন্য কারও কথা শোনার পরে, আপনি তাদের কথা আর নাও শুনতে পারেন। তাদের কথা বলার অধিকারের অর্থ এই নয় যে আপনাকে শুনতেই হবে। অনলাইনে কোনো কিছু পোস্ট করা বা শেয়ার করার আগে অন্তত দুবার ভাবুন। এটি চিরকাল অনলাইনে থাকতে পারে এবং পরে আপনার ক্ষতি করতে ব্যবহৃত হতে পারে। আপনার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর বা আপনার স্কুলের নামের মতো ব্যক্তিগত বিবরণ দেবেন না। আপনার প্রিয় সামাজিক মিডিয়া অ্যাপের প্রাইভেসি সেটিংস সম্পর্কে জানুন। বেশ কিছু পদক্ষেপের মধ্যে এখানে কয়েকটি পদক্ষেপ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আপনি কয়েকটি নিতে পারেন।

কে আপনার প্রোফাইল দেখতে পাবে, কে আপনাকে সরাসরি মেসেজ পাঠাতে পারবে বা কে আপনার পোস্টগুলোতে মন্তব্য করতে পারবে– আপনার অ্যাকাউন্টের প্রাইভেসি সেটিংসকে সমন্বয় করার মাধ্যমে সে সম্পর্কে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

আপনি ক্ষতিকারক মন্তব্য, মেসেজ এবং ফটো সম্পর্কে রিপোর্ট করতে এবং সেগুলো সরিয়ে নিতে অনুরোধ করতে পারেন। আনফ্রেন্ড করা ছাড়াও আপনার প্রোফাইল দেখতে বা আপনার

সাথে যোগাযোগ করা আটকাতে আপনি মানুষজনকে সম্পূর্ণরূপে ব্লক করতে পারেন। সম্পূর্ণরূপে ব্লক না করে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু মানুষ যেন মন্তব্য করতে পারে সে বিষয়টিও আপনি বিবেচনা করতে পারেন। আপনি আপনার প্রোফাইলে থাকা পোস্টগুলো মুছতে পারেন বা নির্দিষ্ট কিছু মানুষজন থেকে এগুলো আড়াল করে রাখতে পারেন।

বুলিংয়ের, বিশেষত সাইবার বুলিংয়ের, বিরুদ্ধে যেসব আইন রয়েছে সেগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন এবং এখনও সব জায়গায় এই আইনের অস্তিত্ব ও প্রয়োগ চোখে পড়ে না। এ কারণে সাইবার বুলিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অনেক দেশ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন যেমন, হয়রানির বিরুদ্ধে আইনকে ব্যবহার করে।

সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। এমন দেশগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করে এমন অনলাইন আচরণকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখা হয়। এসব দেশগুলোর মধ্যে কিছু দেশে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন এমন মানুষজন সুরক্ষা চাইতে পারেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা বন্ধ করতে পারেন এবং অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে সাইবার বুলিংয়ের জন্য সেই ব্যক্তির ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ডিভাইসের ব্যবহারকে বন্ধ করতে পারেন। তবে বুলিদের আচরণ পরিবর্তন করার জন্য সবসময় শাস্তি যে সবচেয়ে কার্যকর উপায় নয়, সে বিষয়টি মনে রাখা জরুরি।

রেজা নওফল হায়দার: তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক লেখক ও সিনিয়র সাংবাদিক, সময় প্রতিদিন

সাইবার নিরাপত্তায় হেল্পলাইন নম্বর

সাইবার নিরাপত্তায় হেল্পলাইন নম্বর

৩৩৩ (৮) (টোল ফ্রি)

১০৪

কিশোর-কিশোরীদের সাইবার অপরাধ রোধে হেল্পলাইন নম্বর

১৩২১৯ (টোল ফ্রি)

এনসিএসএ চ্যাটবট

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) ২০২৬ সংসদে পাস

দেশের শিল্প খাতে দীর্ঘদিনের অস্থিরতা নিরসন এবং শ্রমিকদের অধিকার সুসংহত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ৯ই এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০২৬'। জাতীয় সংসদে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মোঃ নুরুল হক বিলটি উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। গত ১৭ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' বিল আকারে পাসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হলো।

পাস হওয়া নতুন আইনে শ্রমিকদের স্বার্থে বেশকিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে শতকরা হারের জটিলতা থাকছে না এবং সর্বনিম্ন ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতেই ইউনিয়ন গঠনের আবেদন করা যাবে। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন বা চার মাস করা হয়েছে। এছাড়া, বার্ষিক উৎসব ছুটি ১১ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৩ দিনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১০০ বা তার বেশি শ্রমিক কর্মরত আছেন এমন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দুই তৃতীয়াংশ শ্রমিকের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন অথবা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের প্রগতি স্কিমে অংশগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

এই আইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো 'যৌন হয়রানি'র সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নারী প্রধান 'অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি' গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই কাজে নারী ও পুরুষের মজুরি বৈষম্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, গৃহকর্মী, কৃষি শ্রমিক ও নাবিকদের শ্রম আইনের নির্দিষ্ট ধারার আওতায় এনে তাদের অধিকারের আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সরকার আশা করছে, এই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস পোশাক খাতসহ সামগ্রিক শিল্পে ইতিবাচক ও স্থিতিশীল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হবে।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

ধরিত্রী রক্ষা: দায়, দায়িত্ব ও কর্তব্য

ডা. নাজনীন নাওয়াল (বিপাশা)

প্রতিবছর ২২শে এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস'। এ দিবস পালনের মাধ্যমে ধরিত্রী রক্ষায় বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এই দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে বর্তমানে ধরিত্রীর পরিবেশ অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। মূলত আধুনিক সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর চাপ বাড়ছে। এমনি প্রেক্ষাপটে এই দিনে বিশ্ববাসী একত্রিত হয়ে পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য, সবুজ ও টেকসই রাখার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। বিশ্ব ধরিত্রী দিবস এমন একটি দিন; যেদিন মানুষ পরিবেশ, প্রকৃতি ও পৃথিবী রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বস্তুত বিশ্ব ধরিত্রী দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা প্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতি বিনষ্ট হলে আমরাও নিরাপদ নই। এটি শুধু গাছ লাগানো বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আহ্বান নয়, বরং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার একটি বৈশ্বিক আন্দোলন। ২০২৬ সালের ধরিত্রী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'আওয়ার পাওয়ার, আওয়ার প্ল্যানেট' বা 'আমাদের শক্তি, আমাদের ধরিত্রী'। আপাতদৃষ্টিতে এটি সাধারণ একটি বার্তা মনে হলেও, এর গভীরে নিহিত রয়েছে পরিবেশ রক্ষার এক বিশাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আহ্বান।

ধরিত্রী দিবস হলো পরিবেশ সচেতনতা এবং সুরক্ষার জন্য নিবেদিত একটি বার্ষিক বৈশ্বিক আয়োজন। বিশ্বের সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন দেশের সরকার, স্কুল-কলেজ, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও সাধারণ নাগরিকেরা মিলে এই দিনটি পালন করে। এ দিবসটি শুধু উদ্‌যাপন বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি কর্মমুখী দিন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশগত সমস্যাগুলো মোকাবিলায় এবং বাস্তবসম্মত সমাধানের জন্য সাধারণ মানুষ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিত করা। পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জীবনযাপনে উৎসাহিত করাই এই দিবসের লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে– বৃক্ষরোপণ অভিযান,

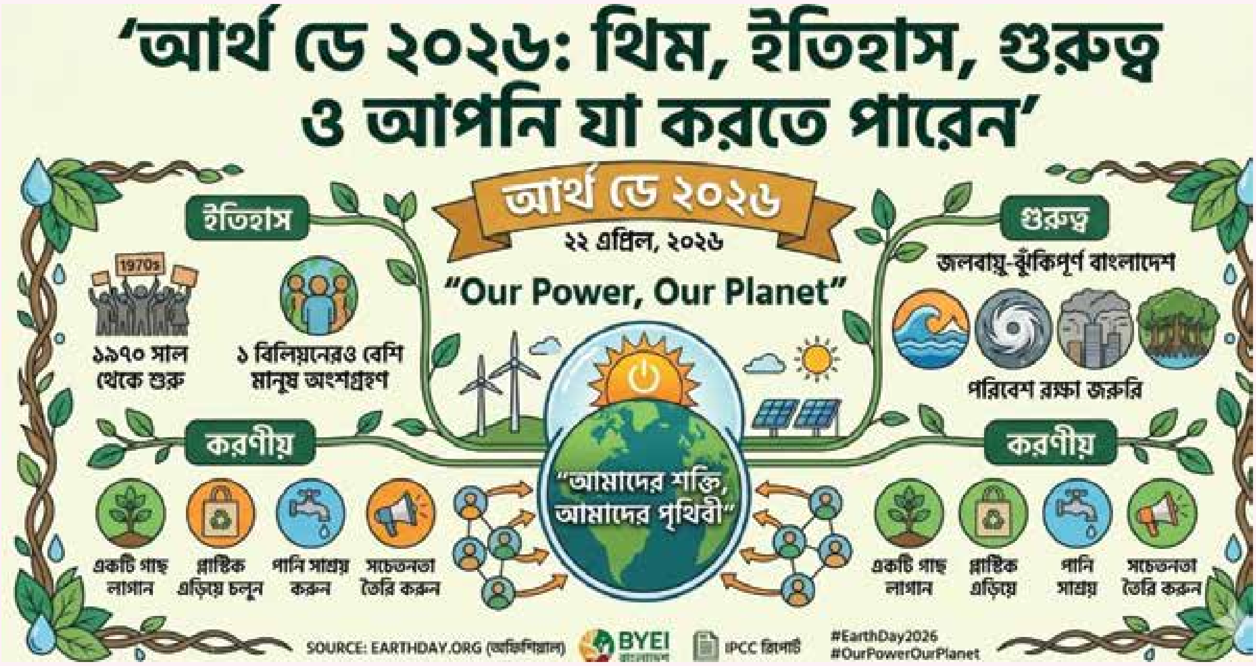

পরিচ্ছন্নতা অভিযান, জলবায়ু পদযাত্রা, শিক্ষামূলক সেমিনার এবং কর্পোরেট ও সামাজিক পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব নানা উদ্যোগ।

১৯৬০-এর দশকে শিল্পায়নের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে দৃশ্যমান পরিবেশগত ক্ষতি শুরু হয়। শহরগুলো ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়, কলকারখানার বর্জ্যে নদী দূষিত হতে থাকে এবং কোনো নিয়মনীতি ছাড়াই যত্রতত্র বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার বাড়তে থাকে। এর মধ্যে ১৯৬৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারায় ভয়াবহ তেল নিঃসরণের ঘটনা এবং ওহাইও নদীর দূষণ পুরো দেশের মানুষের চোখ খুলে দেয়। এমন প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের তৎকালীন সিনেটর গেলর্ড নেলসন পরিবেশ সংস্কারের জন্য জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তৎকালীন যুদ্ধবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশজুড়ে পরিবেশ নিয়ে একটি জাতীয় সমাবেশের প্রস্তাব দেন। এই প্রচারণার দায়িত্ব দেওয়া হয় ডেনিস হেইস নামের এক তরুণ অধিকারকর্মীকে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ২২শে এপ্রিল প্রথমবারের মতো পালিত হয় ‘ধরিত্রী দিবস’। ঐ দিন ২ কোটি মানুষ পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন। এর পরপরই মার্কিন সরকার ‘এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি’ (ইপিএ) বা পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা গঠন করে। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৯০ সালে ধরিত্রী দিবস বৈশ্বিক রূপ লাভ করে। ঐ বছর বিশ্বের ১৪০টিরও বেশি দেশে এই দিবসের প্রচারণা চালানো হয়। এরপর থেকে এটি পরিবেশ সচেতনতার একটি বিশ্বজনীন প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়। পরবর্তী দশকগুলোতে পরিবেশ রক্ষায় ধরিত্রী দিবস অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। ২০১৬ সালের ধরিত্রী দিবসেই ঐতিহাসিক ‘প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে’ স্বাক্ষর করেছিল বিশ্বের ২০০টি দেশ।

বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড়ো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর উষ্ণতার হার বাড়ছে, বরফ গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, অরণ্য উজাড় হচ্ছে এবং নতুন নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এই পরিবর্তনের ঝুঁকিতে রয়েছে। এসব ক্ষয়ক্ষতিগুলোর জন্য মানুষের কর্মকাণ্ড অনেকটা দায়ী। মানুষ প্রকৃতির সম্পদের অপব্যবহার করেছে। পাহাড়-পর্বত, বনাঞ্চল কেটে উজাড় করেছে। নদনদী, খাল-বিল, জলাশয় ভরাট করে আবাসস্থল আর শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাচ্ছে আর তাপপ্রবাহ বাড়ছে। প্রতিবছরে এপ্রিল মাসের তাপপ্রবাহ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের ধরিত্রী দিনদিন উত্তপ্ত হচ্ছে। তীব্র তাপপ্রবাহে মানুষের শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে পানিসংকট দেখা দিচ্ছে। পরিবেশের প্রতি আমাদের প্রভুত্বমূলক আচরণ, প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার, উন্নত জীবনযাপন করতে গিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্যে আঘাত– এসবই হচ্ছে ধরিত্রী বিপর্যয়ের অন্যতম মূল কারণ। বিশ্ব ধরিত্রী দিবস তাই এইসব সমস্যার সমাধানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

বাংলাদেশ একটি জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানে নিয়মিত দেখা যায়। এইসব দুর্যোগের পেছনে রয়েছে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান পরিবেশ রক্ষায় নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। বিদ্যালয় ও কলেজে পরিবেশ সচেতনতামূলক শিক্ষা চালু হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতিকে রক্ষা করার এই লড়াই শুধু একা

কারও নয়, এক্ষেত্রে সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সবার সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

ধরিত্রী দিবস কেবল একটি দিন নয়, এটি একটি দায়িত্বের নাম। আমাদের প্রতিদিনের ব্যক্তিজীবনে কিছু সহজ অভ্যাস গড়ে তুললে আমরা পরিবেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারি।

- পানি অপচয় বন্ধ করা,
- বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা,
- নিজের বাসা ও আশপাশ পরিষ্কার রাখা,
- প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাপড় বা কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করা,
- অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলা,
- ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার না করে পাবলিক যানবাহন ব্যবহার করা,
- কাছাকাছি পথ হলে হাঁটা বা সাইকেল ব্যবহার করা,
- জীবাশ্ম জ্বালানি যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা,
- গাছ লাগানো ও যত্ন নেওয়া ইত্যাদি ভালো কাজে আমাদের ব্যাপৃত হওয়া খুব প্রয়োজন।

বাসযোগ্য নিরাপদ পৃথিবী গড়তে হলে আগে নিজেকে সচেতন হতে হবে এবং অন্যকে সচেতন করতে হবে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাও জরুরি। যেমন– নিয়মিত হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু ব্যবহার করা বা বাইরে যাওয়ার আগে মাস্ক পরার মতো ছোটো ছোটো সচেতনতাও একটি সুস্থ পৃথিবীর জন্য সহায়ক হতে পারে।

ধরিত্রী দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পৃথিবীর প্রতি আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের ছোটো ছোটো সিদ্ধান্ত কীভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে, এটি তার একটি শিক্ষণীয় প্ল্যাটফর্ম। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সব মানুষকে পরিবেশসচেতন করে তুলতে হবে। বৃক্ষ কর্তনরোধ, বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনের দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বনাঞ্চল, নদনদী, খাল-বিল সংরক্ষণ করতে হবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দিকে সব মানবজাতিকে নজর দিতে হবে। রি-সাইকেল পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রব্যের পুনর্ব্যবহার করতে হবে।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের প্রতিযোগিতা হয়। যেমন– রচনা লেখা, চিত্রাঙ্কন, পোস্টার তৈরি, আলোচনা সভা, নাটিকা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতের নেতৃত্ব, তাই তাদের প্রকৃতিপ্রেমী ও পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সম্মেলন করেছে। কিয়োটো প্রোটোকল, প্যারিস চুক্তি এবং কপ (COP) সম্মেলনগুলো পরিবেশ রক্ষার বৈশ্বিক পরিকল্পনার অংশ। এগুলোর মাধ্যমে দেশগুলো নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। তবে কেবল সরকার নয়, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া এসব লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব।

তবে আশার কথা, বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'গ্রিন ডে ট্রেনিং' ও 'আর্থ অলিম্পিয়াড'-এর মতো কর্মসূচি আয়োজন করেছে। নদী দূষণ রোধ, উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন রক্ষা এবং শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তরুণদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সেগান বলেছিলেন, 'পৃথিবী হলো এক বিশাল মহাবিশ্বের বুকে অতি ক্ষুদ্র এক মঞ্চ। আমাদের একমাত্র কাজ হলো এই পৃথিবীকে রক্ষা করা এবং একে ভালোবাসতে শেখা।' ধরিত্রী দিবস কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি প্রতিদিনের অঙ্গীকার। পৃথিবীর প্রতিটি উপাদানকে সম্মান করা। যেহেতু জীবন ধারণে আমাদের পৃথিবী তথা পরিবেশ প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়, সেহেতু প্রকৃতিকে রক্ষা করাই আমাদের দায়িত্ব। আমাদের নিজেদের জীবন রক্ষার মতোই জরুরি। পৃথিবীকে রক্ষায় আমাদের আরও সচেতনতা অনিবার্য। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায়– 'এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব আমি'। অন্তত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বিপর্যয়মুক্ত পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ধরিত্রী দিবসের শপথ হোক– ধরিত্রী রক্ষা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আসুন, প্রতিদিন ধরিত্রী রক্ষায় ছোটো হোক বা বড়ো হোক– কোনো না কোনো কাজ করি। আমাদের ছোটো ছোটো পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপই পারে এই সুন্দর পৃথিবীকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য রেখে যেতে। এই পৃথিবীকে শুধু আমাদের জন্য নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্ম যেন সুস্থ এবং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে সে লক্ষ্যে পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিনির্বিশেষে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

ডা. নাজনীন নাওয়াল (বিপাশা): শিশু ও নবজাতক চিকিৎসক, পদ্মা জেনারেল হাসপাতাল, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা

অটিস্টিক শিশুরাও সম্ভাবনাময়

এমরানা আহমেদ

অটিজমে আক্রান্ত শিশু বা অটিস্টিক শিশু কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরাও জ্ঞানী হয়। সাধারণ শিশুর মতো এদের জ্ঞান সব দিকে সমান থাকে না। এদের কারো থাকে গণিতের ওপর অসাধারণ জ্ঞান, কারো বিজ্ঞানে, কেউবা অসাধারণ সব ছবি আঁকতে পারে, কারো আবার মুখস্থবিদ্যা বেশি থাকে। তাই সহানুভূতি ও সঠিক পরিচর্যায় অটিস্টিক শিশুরা হয়ে উঠতে পারে একজন মহাজ্ঞানী। অনেকেই মনে করেন বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন ও আইনস্টাইন অটিস্টিক ছিলেন। বিখ্যাত অনেক বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক অটিস্টিক ছিলেন।

গবেষণা তথ্যে জানা যায়, প্রতি ১০ জন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে একজনের ছবি আঁকা, গান, গণিত বা কম্পিউটারে দক্ষতা থাকে। অটিস্টিক শিশুকে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে তারাও মেধার স্ফুরণে সমাজকে আলোকিত করতে পারবে। *অটিজম ইন রিয়েল লাইফ* বইয়ের লেখক কিম্বারলি গ্রস রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসা, ইন্স্যুরেন্স ও তাদের উত্ত্যক্তকারীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। লেখক ও সাংবাদিক কিথ স্টুয়ার্ট *দ্যা গার্ডিয়ান* পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রবন্ধ 'হাও টু হেল্প পিপল উইথ অটিজম? জাস্ট বি নাইস'-এ বলেন, 'যখন আপনার একটি অটিস্টিক শিশু থাকে আপনি মানুষের অসহযোগিতায় অভ্যস্ত হয়ে যান, কিন্তু মানুষেরা যদি দয়ালু ও সহনশীল হতে শিখত তবে তা সবার জন্যই ভালো হতো।'

স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার হলো এক ধরনের মানসিক জটিলতা, যেখানে অনেক ধরনের মানসিক সমস্যা একসঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। আর অটিজম এক ধরনের স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার। এ ধরনের নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়ুবিক সমস্যার কারণে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, যার সঙ্গে মানসিক বিকাশগত জটিলতাও প্রকাশ পায়। এই সমস্যার কারণে জন্মের পর ১৮ মাস থেকে ৩ বছর বয়সের মধ্যেই শিশুর আচরণগত এবং মানসিক সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। জানা যায়, ১৯০৮ সালে 'অটিজম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন সাইক্রিয়াটিস্ট ইউজেন ব্লিউলার। আর অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার ধারণার জন্ম দেন অস্ট্রিয়ান মেডিকেল থিয়োরিস্ট হ্যানস অ্যাসপারগার এবং আমেরিকান শিশু মনোবিজ্ঞানী লিও ক্যানার। লিও ক্যানার ১৯৪৩ সালে ১১ শিশুকে নিয়ে গবেষণা করেন। তার গবেষণায় দেখা যায়, ঐসব শিশুর স্মৃতি, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি, ডাক দিলে সাড়া না দেওয়া, সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, একই কথার পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। গবেষণার তথ্যানুযায়ী, সাধারণত ছেলে শিশুরা এ ধরনের সমস্যায় বেশি ভোগে। প্রতি ২৫০ শিশুর মধ্যে একটি শিশুর অটিস্টিক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবাক ব্যাপারটি হলো, অটিস্টিকরা নিম্ন বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হয় না। এরা গড় বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এরা উচ্চ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হয়।

শিশুর বিকাশজনিত একটি সমস্যা অটিজম। অটিজম কোনো বংশগত বা মানসিক রোগ নয়। এটা এক ধরনের স্নায়ুগত বা মানসিক সমস্যা। এ সমস্যাকে ইংরেজিতে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বলে। অটিজমকে সাধারণভাবে শিশুর মনোবিকাশগত জটিলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সমাজের জন্য বোঝা নয়। তাদের ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে তারাও সমাজের জন্য সম্পদে পরিণত হতে পারে। তাই সামাজিকভাবে আমাদের উচিত অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের ভালোবাসা এবং ভালো আচরণ করা। কেননা বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশু অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। একজন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু অথবা বিশেষ শিশুর ভাবনার জগৎ কিংবা আচরণ অন্য শিশুদের থেকে কিছুটা আলাদা হলেও তাদেরও অধিকার রয়েছে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের। তাই তাদের জন্য সহানুভূতির পাশাপাশি দরকার

সহযোগিতার। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুরা সাধারণত অপরের সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ করতে পারে না, তারা অতিরিক্ত জেদি হয়ে থাকে এবং নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও গুটিয়ে রাখার মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। অটিজমের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। তবে গবেষকরা মনে করেন, জেনেটিক, নন-জেনেটিক ও পরিবেশগত প্রভাব সমন্বিতভাবে অটিজমের জন্য দায়ী। শিশুর বিকাশে প্রাথমিক পর্যায়ে এটি সৃষ্টি হয়। পরিচর্যাই এর বিকল্প।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অটিজম এমন একটি বিকাশজনিত সমস্যা যেখানে শিশুদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ, সামাজিক কল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ সমস্যা লক্ষ করা যায়। তবে কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, অটিজমের পেছনে দুটি কারণ রয়েছে– ১. জিনগত সমস্যা, ২. পরিবেশগত সমস্যা। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর ডিএনএ জিনে 'কপি নাম্বার অব ভেরিয়েন্ট' নামক ত্রুটি বহন করে। ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে অটিজমের সঠিক কারণ জানা সম্ভব হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার শিশুর মধ্যে গড়ে ১৭ জন অটিজমে আক্রান্ত। এ সমস্যা মোকাবিলা দেশের জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ।

অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্কদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালে ২রা এপ্রিলকে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালন করা হয়ে। বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক শিশু অটিজম নামের এই নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত। ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে পিতামাতা, পরিবার-পরিজন ও সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা ও যথার্থ পরিচর্যার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুকে বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন বা বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলা হয়। এসব শিশুকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে তাদের অনেকেই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

অটিজম বাংলাদেশের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ এবং এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের অটিজম সোসাইটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ অটিজম আক্রান্ত। বাংলাদেশে প্রায় দেড় লাখের মতো অটিজম আক্রান্ত মানুষ রয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে আরো প্রায় পনেরোশো শিশু। সে হিসাবে প্রতিদিন দেশে ৪ জনের বেশি শিশু অটিজম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য যে জরিপ পরিচালিত হয়, তাতে দেশে ১৪ লাখ ৮৯ হাজার ১৩০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ দশমিক ৮৭ শতাংশ হচ্ছে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, গড়ে প্রতি ১২৫ জন শিশুর মধ্যে একজন অটিজমের সিমটম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অটিজমের কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এর একাধিক কারণ রয়েছে। এটি একটি মাল্টি ফ্যাক্টরিয়াল জিন ইনভারমেন্টাল ইন্টারেকশন। একজন মানুষ অটিজমের বৈশিষ্ট্য থাকবে কি না তা জিনের মধ্যে নির্ধারণ করা থাকে। পরিবেশ যদি তার প্রতিকূলে থাকে সেটার জন্যও অটিজম দেখা দিতে পারে। কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করা শিশু, গর্ভবতী অবস্থায় যেসব মায়েদের পুষ্টিহীনতা থাকে– তারা অটিজমের অধিক ঝুঁকিতে থাকে। এটিকে একটি রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দেশে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে মস্তিষ্কের বিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতা বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (এএসডি) আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বেশি বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) চিকিৎসকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম' (ইপনা)- এর তথ্যানুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে ১৬-৩০ মাস বয়সি প্রতি ১০ হাজার শিশুর মধ্যে ১৭ জন বা প্রতি হাজারে ১ দশমিক সাতজন এবং শহরে প্রতি ১০ হাজারে ২৫ জন বা প্রতি হাজারে ২ দশমিক পাঁচজন শিশু অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। গবেষণাটি আরো বলছে, ছেলেদের মধ্যে আক্রান্তের হার মেয়েদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়া মায়ের বয়স ৩৫ বছরের বেশি হলে এবং উচ্চ

অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকা পরিবারের মধ্যে এএসডির প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিশেষ স্কুল অটিস্টিক বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের মূল ধারার স্কুলে সুস্থ, স্বাভাবিক বাচ্চাদের সঙ্গে পড়ালেখা ও খেলাধুলার সুযোগ দিলে তাদের দ্রুত উন্নতি হয়। অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ রাজি হলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনো কোনো সুস্থ বাচ্চার বাবা-মা স্কুলে অটিস্টিক বাচ্চা নেওয়ায় আপত্তি জানান। তারা মনে করেন, এমন বাচ্চাদের সঙ্গে মিশলে তাদের বাচ্চার ক্ষতি হবে, অথচ এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং অটিস্টিক বাচ্চাদের সঙ্গে সুস্থ বাচ্চা মিশলে অটিস্টিক বাচ্চাদের মানসিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তেমনি সুস্থ বাচ্চারাও নেতৃত্ব, সহমর্মিতা শেখে, হৃদয়বান হয়।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী (২০১৩-২০১৬) দেশে অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা ৪১ হাজার ৩২৯ জন। কুসংস্কার, সামাজিক বাধা ও অজ্ঞতার কারণে অটিস্টিক শিশুরা আজ শিক্ষা ও নানান সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে অটিজম নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষিত লোক ও নির্দিষ্ট অটিজম সেন্টারে ম্যানুয়াল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যদিও তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

'অটিজম বার্তা' একটি মোবাইলভিত্তিক, ইন্টারেক্টিভ ও কমিউনিটি বেজড স্ক্রিনিং টুল, যা অটিজম নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়। বাবা-মা, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা অ্যাপটি ব্যবহার করে অটিজম স্ক্রিনিং ও পরবর্তী করণীয় বিষয়গুলো জানতে পারবেন। অ্যাপটি দ্বারা পরীক্ষার মাধ্যমে একটি শিশুর অটিজম হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ পেলে তার খবর নিকটস্থ অটিজম সেন্টারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি শিশুর অভিভাবককে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অ্যাপটির মাধ্যমে শিশুর অবস্থা মনিটর করা ও পরবর্তীকালে সময়মতো বাবা-মাকে মোবাইলে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি অটিজম বিষয়ক সামাজিক সচেতনতা ও শিক্ষিত করা 'অটিজম বার্তা'র অন্যতম লক্ষ্য।

অটিস্টিক শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন, তরি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ডাউন সিনড্রোম অ্যাসোসিয়েশন, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সূচনা ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইত্যাদি সংগঠন। অটিস্টিক শিশুদের জন্য অন্যতম অটিজম বিশেষায়িত স্কুল রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাবর রোডের অ্যাডভান্সড স্কুল ফর স্পেশাল চিলড্রেন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার 'প্রয়াস', খিলগাঁও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক স্কুল। স্কুলটি সুইড বাংলাদেশের অধীনে পরিচালিত হয়। ঢাকার গুলশানে রয়েছে রেইনবো অটিজম কেয়ার ফাউন্ডেশন প্রভৃতি।

শুধু স্কুল নয়, বাড়ির পরিবেশটি এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে অটিস্টিক শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক হয়। পরিবেশ তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং মেধা বিকাশের উপযোগী হতে হবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলি, যেখানে কোনো অটিস্টিক শিশু বৈষম্যের শিকার হবে না বরং তারা সবার ভালোবাসা ও সহযোগিতায় বেড়ে উঠতে পারবে। তারা বিকশিত হবে সর্বোত্তমভাবে। তারাও যেন হতে পারে বিখ্যাত।

এমরানা আহমেদ: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক
emranaahmed@gmail.com

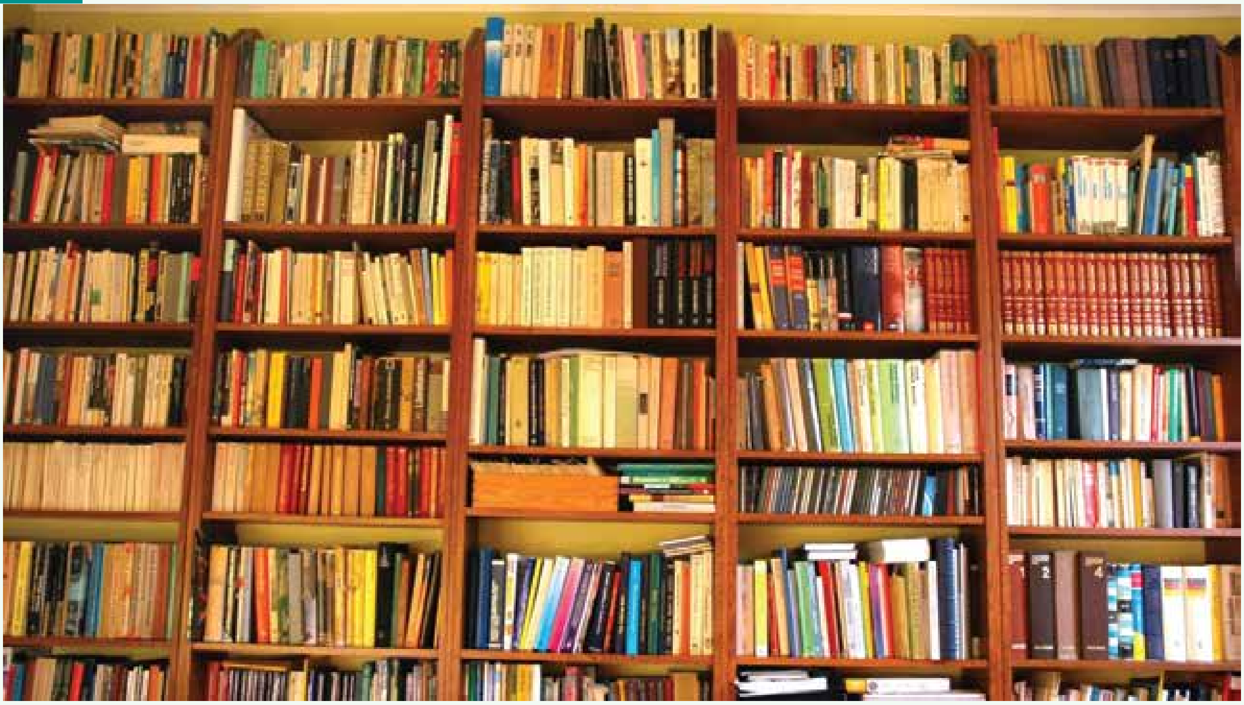

জ্ঞান বিকাশে বই

মো. আরিয়ান হোসেন

বই হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, জ্ঞান, আনন্দ ও কল্পনার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি অতীত ও বর্তমানের সেতু, যা আমাদের চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করে এবং মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে। বই পড়ার অভ্যাস মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়, শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে, যা একটি উন্নত ও আলোকিত সমাজ গঠনে অপরিহার্য।

মোটামুটিভাবে পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। আর এই জ্ঞান আহরিত হয় বই পড়ার মাধ্যমে। যত বেশি পড়বে, ততবেশি জ্ঞান আহরিত হবে। একটা সময়ে বই ছিল আমাদের প্রধান বিনোদন। আমরা শৈশবে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে খেলেছি, বাসায় এসে ঘাড়গুঁজে গল্পের বই পড়েছি। এখন বিনোদনের কোনো অভাব নেই। প্রযুক্তির বদৌলতে একেবারে দুধের শিশুটিও ইউটিউবে কার্টুন দেখতে দেখতে তার দুধের বোতল মুখে দেয়। স্মার্টফোন, নোট প্যাড, ল্যাপটপ আর টেলিভিশন স্ক্রিনের বিনোদন যত তীব্রই হোক না কেন, বই পড়ার সঙ্গে তার কোনো তুলনা নেই।

বই পড়া হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের একটি অসাধারণ প্রক্রিয়া, যেটি আমাদের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়। বই পড়ার মাধ্যমে আমরা পরিচিত হই নতুন নতুন বিষয়ের সঙ্গে। আর এই বই বিষয়ে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন বলেছেন, 'বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক।' জ্ঞান আর আনন্দ ছাড়া মানুষের জীবন নিশ্চল হয়ে পড়ে। জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিত করতে হলে, সুবাসিত করতে হলে জ্ঞানার্জন করতে হবে। আর জ্ঞানার্জনের জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের কথা লুকিয়ে আছে বইয়ের মধ্যে। সুতরাং নিজেকে জানতে হলে, পৃথিবীকে জানতে হলে বই পড়তে হবে। তাই হয়ত আমেরিকার বিখ্যাত অভিনেতা উইল রজারস বলেন, 'মানুষ আসলে দুটি উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। একটি হচ্ছে পড়ার মাধ্যমে আর আরেকটি হচ্ছে নিজের চেয়ে আধুনিক কোনো মানুষের সঙ্গে মেশার মাধ্যমে।' ইংরেজিতে একটি কথা আছে, যার বাংলা হচ্ছে– 'বই মানব জীবনের উৎকৃষ্ট সঙ্গী।' আমরা বাস্তব জীবনে অনেক সময় বিপদাপন্ন হই। বিপদ আসে বাইরে

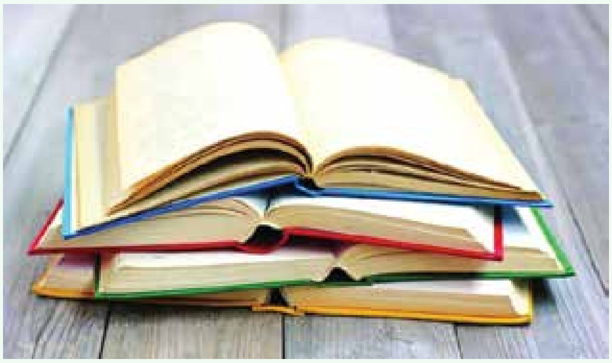

থেকে, বিপদ আসে মনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেও। আর সেই মুহূর্তে অন্য মানুষের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃত বই বিপদের সময় যথার্থ বন্ধুর মতো আমাদের সঠিক পরামর্শ দান করে। কোনো কোনো বই পাঠককে হাসাতে পারে, আনন্দ দিতে পারে এবং কোনো কোনো বই জ্ঞান ও নতুন তথ্য দিতে পারে। তাই প্রত্যেকে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

বইয়ের সান্নিধ্যে আসা মানেই মহামনীষীদের সান্নিধ্য লাভ। দার্শনিক ও নাট্যকার বার্ট্রান্ড রাসেল আমাদের জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে বইয়ের মাঝে ডুব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বইয়ের নির্দেশনায় মানুষ খুঁজে পায় সংগতি, সামঞ্জস্য ও এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা। সাধারণত 'বন্ধু' শব্দটি কতই মধুর! বন্ধুত্ব নৈকট্যের পরিচয়বাহী, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও হৃদ্যতা এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও মানসিক বন্ধনের প্রতীক। বন্ধুত্বের ফাটল বেদনাদায়ক হলেও অস্বাভাবিক নয়; যখন তখন লক্ষণীয়। অনেকে আজ বন্ধু, কাল শত্রু। বন্ধু হয়ে বেইমানি আর বিশ্বাসঘাতকতা কারো কাম্য নয়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত হলেও অহরহ ঘটছে। শুধু বন্ধু কেন, পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে বাবা-মা, ভাইবোন, নিকট আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে দূরত্ব। ছড়িয়ে পড়ছে হিংসা, হানাহানি। পিপীলিকা যেমন বিপদে পানিতে পতিত গাছের পাতাকে বাঁচার অবলম্বন করে নেয়, তেমনি মানুষও বিপদ থেকে বাঁচতে চায়, একটু আশ্রয় খোঁজে। প্রয়োজন হয় ভালো বন্ধুর। রক্ত-মাংসে গড়া মানুষকে যেখানে বন্ধু হিসেবে ভেবেও সন্দেহ হয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল কাজ করে, সেখানে মানুষের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে বই। আর অসৎ বন্ধুর সংস্পর্শে জীবন হয়ে উঠতে পারে বিভীষিকাময়। তাই বই হতে পারে প্রকৃত বন্ধু।

বই পড়ার প্রতি আমাদের চাপ নেই বললেই চলে, যতটুকু আছে ততটুকু নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ে। এর বাইরে যেতে নারাজ। একসময় বাবা-মা পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বই পড়তে নিষেধ করতেন। এখন ধারণা অনেকটা পাল্টেছে। বই পড়ার জন্য প্রয়োজন মানসিকতা, বই থেকে উপকার পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। দারিদ্র্য বই না কেনার কারণ হতে পারে, কিন্তু বই না পড়ার কোনো কারণ নয়। বই এখন সহজলভ্য। স্কুল-কলেজের লাইব্রেরিতে প্রচুর বই পাওয়া যায়, শহরের পাবলিক লাইব্রেরিতেও বই পড়া যায়। এছাড়া অনেক গ্রামগঞ্জেও বিভিন্ন নামে গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগার। নিকটস্থ বন্ধুর কাছ থেকেও বই ধার নিতে পারেন। আর টাকা খরচ করে বই কিনলে তো কথাই নেই। যত ইচ্ছা তত বই কিনতে পারেন। আমাদের দেশে এখন প্রকাশনীও অনেক। তবে বৈষয়িক লাভের কথা চিন্তা করলে বই পড়া সম্ভব নয়। বই হয়ত আপনাকে তাৎক্ষণিক কোনো লাভ দিতে পারবে না। তাই বলে আপনি বই পড়া বন্ধ করে দিলে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

বই পড়তেন পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম। বই পড়া ছিল তার নেশা। কোনো বই হাতে পেলেই তা পড়ে শেষ করে ফেলতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগণিত ও জ্যামিতি ছিল তার প্রিয় বিষয়। এছাড়া দর্শন শাস্ত্রেও ছিল তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি বলেছেন, 'সূর্যের আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সকল কিছুই ভাস্বর

হয়ে ওঠে, তেমনি জ্ঞানের আলোতে জীবনের সব অন্ধকার আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।' বিশ্ববিখ্যাত *মা* গ্রন্থের রচয়িতা ম্যাক্সিম গোর্কি। তার মা অল্প বয়সে মারা গেলে কঠিন সমস্যায় পড়ে গেলেন। দাদামশাই দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। জীবনে কখনো জুতোর দোকানে বয় হিসেবে, কখনো কয়েদি বহনকারী জাহাজে থালা-বাসন ধোয়ার কাজ করেছেন। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এক পেশা থেকে আরেক পেশায় বড়ো হয়েছেন। তবে সবকিছুর মধ্যেও বই পড়া ছিল তাঁর নেশা। বইয়ের কোনো বাছবিচার ছিল না, যখন যে বই পেতেন সর্বভূকের মতো তাই পড়তেন। দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। সন্ধ্যা থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা রুটির দোকানে কাজ করেও ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পেতেন ততটুকু সময়ই বই পড়তেন। বই পড়তে পড়তেই তিনি লব্ধ জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটান বিশ্ববিখ্যাত লেখক হয়ে। তাই মনে রাখতে হবে, মূলত ভালো বই মানবজীবনকে সুন্দর ও মহৎ করে তোলে। মানুষের মনে জাগিয়ে দেয় মানবতাবোধ। যুগ যুগ ধরে যে সত্য ও সুন্দরের সাধনা, তা এনে দিয়েছে বই। বই দৃষ্টিকে করেছে উদার, মনকে করেছে উন্নত; হতাশা ও বিষাদ থেকেও দিয়েছে মুক্তি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'বই পড়াকে যে যথার্থ হিসেবে নিতে পারে, সংসারের দুঃখ কষ্টের বোঝা তার অনেকখানি কমে যায়।'

আলোকিত মানুষ হতে হলে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। তাই শুধু পাঠ্যবই পড়ে আলোকিত হওয়া যায় না। আলোকিত হওয়া যায় বিখ্যাত লেখকদের বিখ্যাত বই পড়ে এবং আনন্দের, গল্পের ও কবিতার বই পড়ে। তাই বড়ো হওয়ার জন্য চাই বড়োর সংস্পর্শ। শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়তে পারলে চেতনা জগৎকে বড়ো করে তোলা যায়। এ জন্যেই বইয়ের কাছে যেতে হবে। বই নিয়ে মনীষীদের বহু উক্তি আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইকে 'অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর উক্তিটি হচ্ছে– 'মানুষ বই নিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে।' চার্লস ল্যাম্বের উক্তি হচ্ছে– 'বই পড়তে যে ভালোবাসে, তার শত্রু কম।' বইকে সুন্দরের প্রতীকরূপে উল্লেখ করে সিডনি স্মিথের উক্তি– 'গৃহের কোনো আসবাবপত্রই বইয়ের মতো সুন্দর নয়।'

আমাদের বই পড়ার অভ্যাস এমনিতেই কম। এখন আরো কমে গেছে। এ বিষয়টির প্রতি বাবা-মার বিশেষ নজর দিতে হবে। সন্তানদের বেশি বেশি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কাগজের বইয়ের পাশাপাশি এখন ই-বুক জনপ্রিয়। ই-বুক বা ডিজিটাল ভার্সনে বই পড়তে উৎসাহিত করুন। সৃজনশীল লেখকদের বই খুঁজে খুঁজে শিশুদের পড়তে উৎসাহ দিন। বই পড়ার অভ্যাসটা মানুষের এক-দুই দিনে হয় না। কেউ আছে ছোটোবেলা থেকেই এই অভ্যাস লালন করে; কেউ আছে বড়ো হবার পর এক-দুইটা ভালো বই পড়ার পর বইয়ের প্রতি ভালোবাসা জন্মানোর ফলে একে অভ্যাস হিসেবে লালন করে। তবে অভ্যাসটা যখন থেকেই গড়ে উঠুক না কেন, সবসময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। অন্তত প্রতি মাসে একটা ভালো বই পড়ার চেষ্টা করতে হবে। একজন মানুষের সুন্দর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে ভালো বই পড়ার মাধ্যমে। তাই জীবনকে আলোকিত করতে হলে, মানবসভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হলে, সর্বোপরি অশালীন, অশ্লীলতা ও কুমানসিক মন্ত্রণা থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই বই পড়তে হবে এবং এর বিকল্পও নাই। তাই এই প্রজন্মের সকলকে বইপ্রেমী হতে হবে। বইয়ের মাধ্যমে আলোকিত জীবন গড়তে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই গড়ে উঠবে সুন্দর-সার্থক দেশ ও পৃথিবী।

মো. আরিয়ান হোসেন: প্রাবন্ধিক

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা আরো সুদৃঢ় করার প্রত্যয়

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনরত ফোর্স কমান্ডার ও হেডস অব মিলিটারি কম্পোনেন্টদের সম্মানে ১৫ই এপ্রিল ২০২৬ এক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল জ্যাঁ-পিয়ের লাক্রোয়া, অপারেশনাল সাপোর্ট বিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল অতুল খারে, অফিস অব মিলিটারি অ্যাফেয়ার্সের ভারপ্রাপ্ত মিলিটারি অ্যাডভাইজার লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেরিল পিয়ার্সসহ বিভিন্ন দেশের ফোর্স কমান্ডার, জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জটিল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনরত ফোর্স কমান্ডার ও হেডস অব মিলিটারি কম্পোনেন্টদের দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, তাদের নেতৃত্বে দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা জাতির জন্য গৌরব ও মর্যাদা বয়ে আনেন। একইসঙ্গে তিনি শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা, পেশাদারিত্ব ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে তাদের অব্যাহত সহযোগিতা ও সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আত্মোৎসর্গকারী শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাষ্ট্রদূত চৌধুরী বলেন, তাঁদের ত্যাগ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবদান আরো জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন: কাওসার আহমেদ

ফুল ভাসানোর উৎসব

সুজন বড়ুয়া

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে একটি ছোটো নদী। বয়ে যাচ্ছে ঝিরিঝিরি। নদীর এ পাশটায় বসতবাড়ি। তবে তা ঠিক পাড়া-মহল্লার মতো নয়। ছাড়া ছাড়া উঁচুনীচু করে তৈরি। আসলে এলাকাটা টিলাময়, অসমতল। তাই গ্রাম গ্রাম ভাব। কিন্তু এটি শহর। এ শহরের নাম রাঙামাটি।

শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের শেষ মাথা এটি। পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে নদীটি বাঁক নিয়েছে এখানে, যেন লাজুক বধূর মতো পা টিপে টিপে চলে গেছে দূরে। তবে বর্ষায় এ নদী যে দুরন্ত যৌবনা তা অনুমান করা যায়। এখন শেষ চৈত্র। রাঙামাটির পাহাড়গুলোর ঢাল বেয়ে নামা শত ঝরনার নীরব অশ্রুধারাই যেন এখন বয়ে নিয়ে চলেছে নদীটি। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে থির থির করে।

আজ ভোর থেকেই পাল্টে গেছে এ নদীর রূপ। শহরের শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের হাসি-আনন্দে নদীর দুকূল মুখরিত। সবার গায়ে ঐতিহ্যবাহী রঙিন পোশাক। মেয়েদের কারো গায়ে পিনন-খাদি, কারো রিনাই-রিসা, কারো বা থামি। ছেলেদের গায়ে ফতুয়া, মাথায় পাগড়ি। ছেলেমেয়ে সবার হাতে হাতে রং-বেরঙের ফুল। টুকরো টুকরো কলাপাতায় করে ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছে নদীতে। ফুলের মধ্যে আছে জবা, গাঁদা অপরাজিতা ইত্যাদি। বিশ গজের মতো চওড়া নদীর বুকটা যেন দোলায়মান রঙিন ফুলের ডালা। ডালাটা মৃদু ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে দূরে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

নদীর এ পাড়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে এ দৃশ্য দেখছিল মনামী। হঠাৎ কার ডাকে যেন তন্ময়তা ভাঙে তার। মনামী। কারো ডাক যেন ভেসে এলো তার কানে। নাম ধরে ডাকছে কি কেউ! কেই-বা ডাকবে! চেনা-জানা কেউ তো এখানে থাকার কথা নয়। একাই তো আছি। মামা পথঘাট চিনিয়ে দিয়ে একা রেখে চলে গেছেন অফিসে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাগনি হারাবে না– এ বিষয়ে তার গভীর আস্থা। তাছাড়া নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা এখানে নেই। তবে এ নামে আরো কেউ কি আছে এখানে? মনে দ্বিধা নিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে মনামী।

হঠাৎ নদীর ওপাড়ে চোখ আটকে গেল তার। লম্বাটে এক তরুণ ছেলে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার গায়ে ফতুয়া, মাথায় পাগড়ি। কে? অরুণাভ চাকমা না? হ্যাঁ, অরুণাভই তো। ঠিক অরুণাভ। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল কাটিয়ে হাত তুলে নাড়াতে থাকে মনামী। অরুণাভর বাড়ি কি তবে রাঙামাটি? কোনোদিন জানা হয়নি। ভেবেছিল চাকমা যখন পার্বত্য কোনো জেলাতেই হবে। তাই বলে রাঙামাটিতে এভাবে দেখা হবে তা ভাবনার মধ্যেই ছিল না একেবারে।

অরুণাভ-মনামী ক্লাসমেট। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে থার্ড ইয়ারে পড়ে তারা। দুজনের চেনা-জানা-পরিচয় ক্লাস পর্যন্তই। এর বাইরে ঘনিষ্ঠতা তেমন নেই। অবশ্য ঘনিষ্ঠ

হয়ে ওঠার পটভূমি যথেষ্ট অনুকূল ছিল। ক্লাসের গোটা দশেক মেয়ের মধ্যে মনামী আর শ' খানেক ছেলের মধ্যে অরুণাভ, মাত্র দুজন বৌদ্ধ। মনামী বড়ুয়া আর অরুণাভ চাকমা। সুতরাং দুজনের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ক্লাসের আগে-পরে কারণে-অকারণে অরুণাভ মনামীর কাছে আসার চেষ্টাও করেছে অনেকবার। মনামীর মনে হয়েছে ধর্মীয় সাদৃশ্যের জন্যই হয়ত অরুণাভর এই দুর্বলতা। সে ধরা দেয়নি। এড়িয়ে গেছে এভাবে-ওভাবে। একবার তো 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই আপ্তবাক্যই যেন ফলে গিয়েছিল অরুণাভর পক্ষে। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদমিনারে ফুল দিতে গিয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছিল মনামী। তখন স্রেফ ঢাল হয়ে তাকে সেখান থেকে অক্ষত বের করে এনেছিল অরুণাভ। তবু মনামীর মতান্তর ঘটেনি এতটুকু।

অরুণাভকে দেখে এক ঝলকে সব কথা মনে এলো মনামীর। নাই-বা হলো ঘনিষ্ঠতা, ক্লাসমেট তো। আকস্মিক দেখা! একটু সৌজন্য তো দেখাতে হয়। দুজনের মনেই যেন চলছে একই ভাবনা-তরঙ্গ। পরস্পরের দিকে চুপচাপ খানিকটা তাকিয়েছিল দুজন। তারপর হঠাৎ ঘোর কাটিয়ে অরুণাভ বলে উঠল, দাঁড়াও, আমি আসছি।

মনামী নদীর ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল আগের মতোই। মুগ্ধতা নিয়ে দেখছে আশপাশ। ওদিকে পাহাড়ে উঁচু উঁচু গাছের সারি। চাপালিশ, গর্জন, গামারি, সেগুন, কড়ই, সোনালু, জারুল, পলাশ, জলপাই, বকুল, আবার কোথাও বাঁশঝাড়। সদ্য বৃষ্টিতে ধোয়া গাছপালা যেন পেয়েছে নতুন জীবনের ইশারা। দিকে দিকে পাতায় পাতায় হলদে-সবুজে মাখামাখি। চিকচিক করছে রোদে। কী সুন্দর! মনপ্রাণ হারিয়ে যায়।

অরুণাভ হাঁপাতে হাঁপাতে মনামীর পাশে এসে দাঁড়ায়, যেন অনেকটা পথ ঘুরে দৌড়ে এসেছে। তবু ক্লান্ত নয়, উল্লসিত হাবভাব তার। চোখেমুখে অপার বিস্ময়, মনামী, তুমি এখানে কী করে এলে?

মনামী হাসে, আমি মামার বাসায় বেড়াতে এসেছি। এবার নববর্ষের ছুটি কম বলে ঢাকার বাসায় যাইনি। এদিকে চলে এলাম। কিন্তু তুমি এখানে! তোমার বাড়ি রাঙামাটি নাকি?

হ্যাঁ, কাছেই। অরুণাভ হাত তুলে বাড়ির পথ দেখায়। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, তোমার মামা এখানে কী করেন?

মামা পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সে চাকরি করেন। বছর খানেক আগে বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। কেবলই বলেন, আসো, বেড়িয়ে যাও। এবার মনে হলো, যাওয়া যায়, তাই চলে এলাম।

-তার মানে রাঙামাটিতে তুমি এবারই প্রথম এসেছ।
মনামী হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ায়।

-তা হলে তো আমাদের এসব অনুষ্ঠান দেখা তোমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। নদীতে ফুল ভাসানো এই অনুষ্ঠানের নাম জানো?

মনামী কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ।

অরুণাভ বলতে শুরু করে আবার, আজ চৈত্র মাসের ২৯ তারিখ। আরেকটি বাংলা বছর শেষ হতে চলেছে। এই সমাপনীর নাম তো জানো, চৈত্রসংক্রান্তি। এরপরই আসবে বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখ। চৈত্রসংক্রান্তি-নববর্ষ মিলিয়ে আমাদের এখানে থাকে তিন দিনের অনুষ্ঠান। নদীতে এই যে ফুল ভাসানো, এর নাম ফুল বিজু। বছরের শেষ দিন ৩০শে চৈত্র, হবে মূল বিজু। পরের দিন আসবে নতুন বছর, বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখ। এই তিন দিনই এখানে থাকে নানারকম আয়োজন। ফুল বিঝুর দিন সবাই ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। আর কিশোর-তরুণ-তরুণীরা গঙ্গা দেবীর উদ্দেশে নদীতে ফুল ভাসিয়ে দেয়। ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে তারা পুরানো বছরের দুঃখ-কষ্ট ভাসিয়ে দিয়ে নতুন বছরের জন্য সুখ-শান্তি কামনা করে। আর ৩০শে চৈত্র মূল বিজুর দিন কী হয় জানো? মূল বিজুর দিন প্রতিটি বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। এতে বিভিন্ন তরকারি দিয়ে নিরামিষ রান্না হয়, তাকে এখানকার ভাষায় 'পাঁচন' বলে। ওই পাঁচনে তেতো ও মিষ্টিসহ সব রকম স্বাদের আনাজ মেশানো থাকে। বিশ্বাস করা হয় যে, বছরের শেষ দিন তেতো, মিঠে সব রকম স্বাদের খাবার খেয়ে বর্ষ বিদায় দিলে আগামী বছরও ভালো কাটবে। এই দিন তরুণীরা বয়স্কদের জন্য নদী থেকে জল তুলে আনে। সেই জলে তাদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। সদ্য বিবাহিতরা বর-কনেসহ বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যায়। ছোটো ছেলে-মেয়েরা ভিটে-বাড়ির আনাচেকানাচে পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের জন্য খই, চাল, ধান, ভাত ইত্যাদি ছিটিয়ে দেয়। আর বছরের এই শেষ দিনে বসে রকমারি জিনিসের মেলা, হয় বলী খেলা ও ষাঁড়ের লড়াই। নববর্ষের দিন মঙ্গল কামনায় মন্দির-প্যাগোডায় চলে প্রার্থনা।

অরুণাভর কথা শুনতে শুনতে মনামী রীতিমতো রোমাঞ্চিত। পার্বত্য অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান কত আলাদা ও আড়ম্বরপূর্ণ! এখানে না এলে জানাই হতো না। মনে পড়ে ছোটোবেলায় এক চৈত্রসংক্রান্তির সময় বাবা গ্রামের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। মা-বাবা-ভাইবোন সবাই মিলে যাওয়া এবং গ্রামের সেই বর্ষ বিদায়-বরণের অনুষ্ঠান দেখাও আনন্দের ছিল। তবে এত নতুন কিছু তখন গ্রামে দেখেনি। চৈত্রসংক্রান্তিতে এমন ফুল ভাসানোর আয়োজন আর কোথায় হয়! মনামী উচ্ছ্বাস ভরা গলায় বলে, তোমাদের চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষ বরণ সত্যি অনেক মজার।

–চলো, ওদিকটায় বসি। বসে বসে দেখলে আরো ভালো লাগবে। অরুণাভ নদীর পাড় ধরে সামনে এগিয়ে যায়।

নদীর পাড়ে ছায়াময় একটি জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে দুজন। মনামী বসতে বসতে বলে, অরুণ, তোমাকে তো আমি চিনতেই পারছিলাম না। হাসি আর হাত নাড়ানো দেখে মনে হলো তুমি।

তিন বছর ধরে দেখছ, একসঙ্গে লেখাপড়া করছি, এতদিনে

চিনতে পারলে না, এই ঝাঁকের মধ্যে হঠাৎ তুমি আমাকে চিনবে সে আশা আমি করব কেন?– অরুণাভর গলায় যেন কেমন এক অভিমানের ঢেউ।

মনামী সেদিকে আমল দেয় না। হালকা চালে বলে, এই সাজপোশাকে তো তোমাকে আর দেখিনি। যেই রংচঙা তোমার ফতুয়া আর পাগড়ি। চেনার কোনো জো আছে?

-আজকের দিনে এসব পরতে হয়, এটাই ঐতিহ্য।

হ্যাঁ, এই ঐতিহ্যই তো আমাদের সৌন্দর্য। অথচ এর কদর আমরা করতে জানি না– বলেই মনামী দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে চায়। ফুল ভাসানো আর কতক্ষণ চলবে?

দুপুর পর্যন্ত তো চলবেই। বিকালেও কেউ কেউ আসে। শুধু চাকমা নয়, এখানেই কত গোত্র-বর্ণের মানুষ! মারমা, রাখাইন, ত্রিপুরা, চাক, খ্যাং, খুমি, লুসাই, পাংখো, বোম প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসাধারণও পালন করছে এই উৎসব। প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে কিন্তু নববর্ষ উৎসব নিয়ে গান ও নাচ আছে। মারমা ও রাখাইন যুবক-যুবতীরা এই দিনে জল ছিটানো উৎসব করে– অরুণাভ একটানা কথাগুলো জানায়।

-বাহবা, এখানে মানুষের কী নির্মল আনন্দ! কত অকৃত্রিম আর প্রাকৃতিক জীবনধারা! পাহাড়ের বনবাদাড় থেকে ফুল তুলে আনছে, আবার ভাসিয়ে দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে আবেশে চোখ বুজে আসে মনামীর। ছোট্ট এই দেশ আমাদের। অথচ কত বৈচিত্র্য! সমতল-নদী-সাগর-পাহাড়-হাওর-বাঁওড় প্রকৃতির কী অপূর্ব মেলবন্ধ! সমতলের আটপৌরে জীবনধারায় পার্বত্য জেলাগুলো যেন এনেছে আশ্চর্য রঙিন স্পন্দন। মনামী ভাবাবিষ্ট। সময় বয়ে যায়।

অরুণাভ দূরে চোখ রেখে বলে, চলো, এবার আশপাশটা একটু ঘুরে দেখি।

মনামী আমতা আমতা করে, দেখা যায়, তবে বেশি দূরে যাওয়া যাবে না। বাসায় মামি অসুস্থ, দেরি হলে চিন্তা করবে।

ও হ্যাঁ, মামার বাসায় কে কে আছে বললে নাতো– বলতে বলতেই অরুণাভ বসা থেকে উঠে পা বাড়ায়।

মনামী তাকে অনুসরণ করে। হালকা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে, বাসায় মানুষ শুধু দুজন, মামা-মামি। মামা নিউলি ম্যারিড।

ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে তো একবার যেতে হবে। বিশেষত কালকে আমাদের মূল বিজু, অতিথি আপ্যায়নের দিন। তাছাড়া এত কাছে এসে বাড়িতে না গেলে কেমন হবে? কখন যাবে বলো– অরুণাভ এবার মনামীর চোখে চোখ রাখে।

-দেখি, মামা-মামির সঙ্গে প্রোগ্রাম মিলিয়ে তোমাকে জানাবো।

অরুণাভ আর কথা বাড়ায় না। দুজন হাঁটতে থাকে পাশাপাশি। হাঁটতে হাঁটতে এবার চলে এলো পলওয়েল পার্কে। এখান থেকে হ্রদ সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগে। প্রশস্ত হ্রদ যেন মানুষকে মুগ্ধ করার জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছে উদার বক্ষ। হ্রদকে আরও মোহনীয় করে তুলেছে দুপাড়ের সবুজ গাছপালা। এদিক-ওদিক ঘুরে কিছুক্ষণ হ্রদের রূপ-শোভা দেখে ফিরে আসে দুজন। মামার বাসার কাছে এসে বিদায় নেয় অরুণাভ, তাহলে তোমার সুবিধামতো ফোন করো। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

বিকালে আর কোথাও বের হওয়া হয় না মনামীর। মামার অফিস থেকে ফিরতে দেরি হলো। রাতে খেতে খেতে বললেন, সকাল সকাল উঠে পড়িস, কাল আমরা অনেক বেড়াবো।

সকালে ঘুম ভাঙতেই বের হওয়ার তোড়জোড়। আজ মামির শরীর অনেকটা ভালো। মামিসহ তিনজনই বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে। স্নিগ্ধ মধুর আবহাওয়া। বাতাসে স্বাস্থ্যকর সতেজতা। দূরে পাহাড়ের মাথায় বছরের শেষ সূর্যের আভা। যেন জীবনের যাবতীয় ব্যর্থতা-গ্লানি, অকল্যাণ-অমঙ্গল-চিহ্ন শুষে নেওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছে। মাঝে মাঝে জীবন-জীবিকার টানে পথে ব্যস্ত ছুটছে দু-একজন স্থানীয় লোক। কারো কাঁধে পাকা কলার কাঁদি, কারো মাথায় আনারসের ঝাঁকা। মনামীর কাছে এ এক নতুন জগৎ।

দেখতে দেখতেই মামা নিয়ে এলেন কাপ্তাই হ্রদের ঝুলন্ত সেতু এলাকায়। বিপরীতমুখী দুটি পাহাড়কে যুক্ত করেছে এই সেতু। রাঙামাটির প্রতীকী আকর্ষণ এটি। সেতুতে উঠলে স্প্রিংয়ের বেড়ে দাঁড়ানোর মতো নৃত্যানুভূতি জাগে। মনামী মৃদু নাচের দোলায় দুলতে দুলতে এদিক-ওদিক তাকায়। হ্রদ যেন দুই পাহাড়ের চাপে এখানে কিঞ্চিৎ ছোটো হয়ে দুপাশে ডানা মেলেছে ইচ্ছেমতো। বিশেষ করে ডানদিকে ধু-ধু জলরাশি।

ঝুলন্ত সেতু ঘুরে মনামীদের নিয়ে মামা চলে এলেন তার অফিস হলিডে কমপ্লেক্সে। নাশতা পর্বটা সারা হলো এখানেই। যেন মূল বিজু উপলক্ষ্যে যথার্থ অতিথি আপ্যায়ন। সুস্বাদু ও মুখরোচক। নাশতা খেতে খেতেই জানা গেল পরের অভিযান শুভলং ঝরনা। যেতে হবে বোটে। নিচে ইঞ্জিন বোট তৈরি। এবার যাত্রী শুধু দুজন। মনামী আর মামি। মামা যাবেন না। তাকে অফিস করতে হবে। কিন্তু দুই যাত্রীর কেউই সাঁতার জানে না। তাই দুজনের গাঁইগুঁই অবস্থা। মামা অভয় দেন, যাও, যাও, ভয় নেই, এ নৌকা ডোবে না।

নৌকার ঘাট একেবারে কাছে। বলা যায় হলিডে কমপ্লেক্সের পায়ের সঙ্গে লাগোয়া। আসলে হলিডে কমপ্লেক্স হ্রদের ধার ঘেঁষে অনেকটা জলের ওপর ভাসমান। নাশতার টেবিল থেকে হ্রদ দেখা যাচ্ছিল। বোটে বসে মনামীর মনে হলো মামার অফিসটার লোকেশন দারুণ। এর আকর্ষণেই তো লোকজন বেড়াতে আসে।

বোটে চড়েই সাঁতার না জানার ভয় কেটে গেল দুজনের। শান্ত হ্রদ, স্রোত নেই। তবে একেবারে অগভীর নয়। এদিক-ওদিক

থেকে বোট চলাচল করছে আরো। বোটের চলাচলে হঠাৎ হঠাৎ প্রবল ঢেউ জাগছে পানিতে। সেই ঢেউয়ের দোলায় দুলে দুলে উঠছে বোটগুলো। কিন্তু কারো মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই কোনো। মনামীরাও ভয়হীন বসে রইল চুপচাপ। বোট এগিয়ে চলছে হ্রদের পানি সাঁতরে। দুপাশে কোথাও একটি-দুটি বাড়িঘর, কোথাও হিজল-তমাল গাছ ঝুঁকে আছে পানিতে। আবার কোথাও খাড়া পাহাড়-টিলা। কোথাও পাহাড়-টিলার ফাঁক দিয়ে হ্রদ থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে গ্রামের পথ। পাহাড়-টিলা থেকে কোথাও গড়িয়ে নামছে সরু ঝরনাধারা। এভাবে ঘণ্টা খানেক চলতে চলতে বোট পৌঁছে গেল শুভলং ঝরনার প্রান্তে। এখানে ঝরনার ধারা বেশ খরতর। ঝরনা আর হ্রদ প্রায় একাকার। এপাশ-ওপাশ দেখে তারা খানিকটা সময় কাটালো এখানে। তারপর ফেরার পালা। সেই একই পথ, ফেরাও হলো একইভাবে।

বিকালে আবার বের হতে হলো মামার সঙ্গে। এবার নিয়ে এসেছেন রাজবন বিহার প্রাঙ্গণে। এখানে বসেছে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। কী নেই মেলাতে! শিশুদের নানা ধরনের খেলনা– মাটির পুতুল, হাতি-ঘোড়া-বাঘ, টমটম গাড়ি, বড়োদের সংসার সামগ্রী, শাড়ি-চুড়ি-পোশাক ইত্যাদি। এক পাশে রয়েছে বিনোদন ব্যবস্থা– নাগরদোলা, বেলুন ফাটানো খেলা। সেইসঙ্গে উঠেছে ফলফলাদি। সবই পার্বত্য এলাকার ঐতিহ্যবাহী জিনিস। প্রায় সব বিক্রেতাও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর। আর ক্রেতা সব অভিবাসী প্রবাসী বাঙালি সাহেবসুবো ধূপ-দুরস্ত কর্তাশ্রেণির। সারা মেলায় যেন বাঙালিদেরই দাপট। বিক্রেতারা সবাই যেন অতিথি সমাদরেই ব্যস্ত। সহজসরল দীনহীন নিরীহ ভাবভঙ্গি। কেনা-বেচা চলছে খুশিমনে। বর্ষবিদায় আর বর্ষবরণের মেলা বলে কথা। আন্তরিক আনন্দের ছোঁয়া যেন চারদিকে।

মেলা থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। সারাদিন কাটল প্রায় হুড়োহুড়ির মধ্যে। তবু অরুণাভর কথা মনে হয়েছে কয়েকবার। ফোন করা হয়নি। এবার চেষ্টা করা যায়। সেল ফোনটা হাতে নিয়ে মনামী অরুণাভকে রিং দিলো একবার। কিন্তু রিং বাজল না। আবার দিলো। একই অবস্থা। কল ড্রপ হয়ে যাচ্ছে। কথা হবে না? অগত্যা নিরস্ত হয়ে বিশ্রামে ডুবে গেল মনামী।

মনামী এখন বসে আছে বাস কাউন্টারে। আজকের সকালটা তার কেটেছে অন্যরকম ব্যস্ততায়। মামা-মামির সঙ্গে যেতে হয়েছে বিহারে। অংশ নিয়েছে নববর্ষের প্রার্থনায়। তারপর বাসায় খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়েছে বাস কাউন্টারের উদ্দেশে। আগামীকাল ভার্সিটি খুলবে। আজই তাকে ফিরতে হবে ভার্সিটির হলে। বাসে ফেরার টিকিট করে রেখেছিল আগেই। দুপুর দুটোয় তার বাস। মামাকে অফিসে যেতে হবে বলে একটু আগেভাগেই ভাগনিকে পৌঁছে দিয়ে গেছে কাউন্টারে।

এখন দুপুর দেড়টা। একটু পরেই বাস ছাড়বে। যাত্রীরা জমা হচ্ছে একে একে। মনামী গেটের দিকে তাকিয়ে আছে আনমনে। হঠাৎ তার দৃষ্টিসীমায় স্পষ্ট হয়ে উঠল অরুণাভ। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে কাউন্টারে। অরুণাভও কি এই বাসে ফিরবে? রোমাঞ্চিত মনামী হাত তুলল যেন নিজের অজান্তে।

মনামীকে দেখে হঠাৎ কেমন মিইয়ে গেল অরুণাভ। যেন কিছুটা বিষণ্নতার ছোঁয়া। তবু এগিয়ে এলো ধীর পায়ে, ফিরে যাচ্ছ?

মনামীর অস্ফুট উত্তর, যেতেই তো হবে। তুমিও নিশ্চয়।

হু হু, তোমার সঙ্গে কথা নেই। তুমি ফোন করনি। এত কাছে এসে আমাদের বাড়িতে গেলে না– অরুণাভর গলায় অভিমান মেশানো অনুযোগ।

মনামী নিজেকে দায়মুক্ত করতে চায়, ফোন করিনি, এটা ঠিক না কিন্তু। দেখো, গতকাল সন্ধ্যায় কত বার ফোন করেছি। কিন্তু রিং যায়নি। কল ড্রপ হয়ে যাচ্ছিল কেবল। নেটওয়ার্ক সমস্যা কি না কে জানে!

-তোমার সিম কোন অপারেটরের?
-কেন, গ্রামীণ ফোন।

ওহ, তাই বলো। পার্বত্য জেলাগুলোতে গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্কের বেশ সমস্যা। তবু ইচ্ছে থাকলে যে-কোনোভাবে যোগাযোগ করা যেত। মামি বা কারো ফোন থেকে একবার ট্রাই করতে। হয়ত তোমার কাছে এসব কিছুই না– বিরস মুখে সামনের চেয়ারে বসে পড়ে অরুণাভ।

মনামী অরুণাভর গোমড়া অবয়বের ওপর চোখ বুলায়। ফর্সা মুখমণ্ডল যেন ক্রমেই ঢেকে যাচ্ছে আলকাতরার আবরণে। এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে অরুণাভ ঠিক বাংলাদেশের মানচিত্রে পার্বত্য জেলাগুলোরই মূর্ত প্রতীক। নিরীহ করুণ অপাঙ্‌ক্তেয় দুঃখমাখা। অথচ ক্লাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল-উচ্ছল-উদ্যমী ছাত্র অরুণাভ। নিজেকে সে এতটা উপেক্ষিত কেন ভাববে তবে?

মনামী এবার খোলস ছাড়ে। দুষ্টুমি ভরা কণ্ঠে বলে, হ্যালো স্মার্ট গাই, এমন হতাশ ভঙ্গি আপনাকে মানায়? ওঠেন, এবার আমার একটা উপকার করেন– বলতে বলতে ব্যাগ থেকে বাসের টিকিটটা বের করে অরুণাভর দিকে বাড়িয়ে ধরে, যান, এটা পাল্টায় আনেন।

অরুণাভ কিঞ্চিৎ চমৎকৃত, মানে?

মনামীর মুখজোড়া রহস্যময় হাসি, মানে বুঝলে না? হয় আমাকে তোমার কাছে নাও, নয়ত তুমি আমার কাছে আসো।

অরুণাভ আগের মতোই অনড়, হেলদোলহীন। মনামীর কথার মর্মার্থ যেন বুঝতে পারে না সহসা।

মনামী এবার রসে আরো টইটম্বুর। আরে সরলবাবু, বলছি কাউন্টারে যাও, দুজনের টিকিট পাল্টে তোমার-আমার সিট পাশাপাশি পাওয়া যায় কি না দেখ।

অরুণাভের ফর্সা অবয়ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে হঠাৎ, হ্যাঁ, ওইটা মন্দ হয় না। চেষ্টা করা যাক।

বৈশাখের পাঠ
সাবরিন সুলতানা

রোদেপোড়া বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠে এখন বুকফাটা মাটির তৃষ্ণা;
এক পশলা বৃষ্টির আশায় সেখানে স্থির হয়ে আছে কৃষকের চোখ।

বৈশাখ তো ঈশান কোণে জমে ওঠা কালো মেঘ আর ধুলো ওড়ানো ঝড়।
যে ঝড়ের দাপটে সশব্দে ভেঙে পড়ে গাছের মরা ডাল–
ঠিক সেভাবেই খসে পড়া দরকার আমাদের চারপাশের পুরানো জীর্ণতা।

তীব্র দাবদাহ শেষে যখন প্রথম বৃষ্টি নামে,
তৃষ্ণার্ত মাটি জল শুষে নিয়ে বুকে ধারণ করে নতুন বীজ।
ঝড়ের তাণ্ডব আর পোড়া মাটির এই রূঢ় বাস্তবতার ভেতর দিয়েই–
নীরবে শুরু হয় নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প।

বৈশাখ এলো পাড়াগাঁয়ে
শারমিন নাহার ঝর্ণা

বৈশাখ এলো পাড়াগাঁয়ে খুশি রাশি রাশি,
নতুন বছর এলো নিয়ে আনন্দ আর হাসি।
গাছের পাতা হাওয়ায় দোলে পাখির মিষ্টি গান,
মিষ্টি পাখির গানে গানে ভরে সবার প্রাণ।

সবুজ ক্ষেতে ঢেউ তুলেছে হালকা বাতাস বয়,
চাষার মুখে হাসি ফোটে বুকে আশা রয়।
শিশুর হাতে রঙিন ঘুড়ি আকাশজুড়ে উড়ে,
শিশুরা সব খুশি মনে যে যার মতো ঘুরে।

পান্তাভাতে লবণ-মরিচ, ইলিশ ভাজা পাশে,
মজা করে খায় যে সবাই মনটা সুখে হাসে।
গ্রাম্য মেলায় ঢোলের তালে নেচে ওঠে মন,
মেলা দেখতে যায় অনেকে সাথে আপন জন।

বাঁশির সুরে মিশে থাকে গ্রামের কত স্মৃতি,
বৈশাখ এলে সবার সাথে বাড়ে স্নেহ প্রীতি।
পুরান দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুন স্বপ্ন গাথি,
বৈশাখ এলো পাড়াগাঁয়ে সুখে কাটুক রাতি।

বৈশাখ এলো
আবুল কালাম তালুকদার

বৈশাখ এলো ধরার মাঝে
হাজার ফুলের মেলায়
বৈশাখ এলো নাগরদোলায়
খোকা খুকির খেলায়।

বৈশাখ এলো দুঃখ ভুলে
নতুন দিনের আশা
বৈশাখ এলো আলোর নাচন
সুখের ভালোবাসা।

বৈশাখ এলো ঢোলের তালে
হাজার সুরের বাঁশি
আঁধার কেটে আলোর ভোরে
পূর্ণ সুরে হাসি।

বৈশাখ এলো কচি পাতার
সবুজ ঘেরা দেশ
বৈশাখ এলো শস্য শ্যামল
সোনার বাংলাদেশ।

বৈশাখচিত্র
মামুন চাকলাদার

আমি বৈশাখ দেখেছি এই বাংলায়,
মাটির পথে ঝলসানো রূপ আঁকে কৃষ্ণচূড়ায়।
ঝড়ের বিধ্বংসী থাবায় আছড়ে পড়ে বৃক্ষ-তরুলতা,
নিশীথে কোন অনলে পুড়ে আম্রপালি
জানে কি এই একপেশে বৈশাখি ঝড় তা?
কৃষকের তামাটে নির্মেদ শরীরে ঘামের ফোয়ারায়
কতবার দেখেছি নিষ্ঠুর বৈশাখ এই বাংলায়।
ধানের কায়া নীরবে দেয় ছায়া কৃষকের মাথে,
কৃষানি অশ্রু মুছে শুকায় ধান জোছনা রাতে।
কৃষকপুত্র অনায়াসে ভিজায় ধান বোবা চোখের জলে।
ক্ষেতের ধান পিঠার ধান হয়ে আর আসে না তার গোলায়–
চলে যায় নীরবে...
এমনই পাথুরে বৈশাখ দেখেছি এই বাংলায়।

জানো উত্তপ্ত দুপুর, জানো মেঘখণ্ড, ওগো মাতাল হাওয়া
কৃষকের পিঠ ভেজা থাকে চিরকাল–
রোদে ভিজে, বৃষ্টিতে হয় স্রোতের নদী...
অশ্রু আর বৃষ্টির পানি জনমভর মুছে সে ঋণের ভেজা তোয়ালে নিরবধি!

মৃত্যু শিয়রে তুমি
সিরাজুমমুনীর

মৃত্যু শিয়রে অনবরত ভাবি
বাধাহীন অনবদ্য কাব্যগাথা
জীবনের কৈশোর কৈশোরের জীবন
যৌবনের অবিচল বাধাহীন পথচলা।

এ কোন পথহীন গতিপথে পথনিদ্রা
নিভে যাবে আলোকমালা
ঝুম ঝুম আলতো চোখ যাবে মিলে।
তুমি থাকবে একা একার সমুদ্রে
নির্জন নিবাসে নিভু নিভু আলোয় নিভৃতে।

হয়ত কষ্টে কষ্টে কাটবে দিনভর
জ্বলে যাবে আমৃত্যু নখরের ঘায়ে।
তুমিও ঢলে যাবে মৃত্যু শিয়রে একদিন।

দহনে রুদ্রলিপি তার
এস এম তিতুমীর

পরবাসী মেঘ, পরাভূত
শুষ্কতার কাছে। রুদ্রতার রুমালে তোলা ফুল
সৌরপ্রতাপে ফিকে হলে, আকাশ ভাঙে
আপন মাথা। মাটির ভিতর মাটিরা কাঁদে
রস অভাবে। উদ্ভিন্ন সত্যের রুগ্নতা
অশণিসংকেত দিলে অন্ধকার ঘন হয়ে আসে।

প্রেমবিলাসী সভ্যতার ইতিহাসে, কাকতাড়ুয়া হাসে।
পুতুল প্রতীম মানবিক চেতনার মাঠে পুড়ে যায়
লকলকে কচি ঘাস, শান্ত আবাস
বিধ্বংসী গোলা বিস্ফোরিত সভ্যতার হাতে,
জীবন ঝড়ো আর খণ্ডিত মিসাইল আঘাতে।
লক্ষ্যভেদী ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বোঝে না জীবনের মানে।
খণ্ডিত, অখণ্ড ঐক্য। মানুষ মরে যায়, মানুষেরই কাছে।
সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে-রাত পুরোটাই দুষ্ট চক্রের দখলে।
তবু আছে, তাল পাখার বাতাস এই বাংলার,
এখনও এখানে নামে মেঘ ধুয়ে দেয় মলিন, করে সব ছারখার!
এখনো বোশেখ আসে রূপ নিয়ে রুদ্রতার,
এসো, দ্যাখো, বাংলাজুড়ে এখনো দহনে ছাপে সে রুদ্রলিপি, শুদ্ধতার।

সাঁকো
মনির জামান

নদী মরে যাওয়ার কালে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়
চেয়ার পেতে বসে মুখ বুজে বিমূঢ় দেখে
আর সব নদীদের চলাচল
অস্তগামী সূর্যের লালমুখ বিষাদের রং ছড়ায় আকাশ মেঘে!

জোনাকজ্বলা সন্ধ্যায় কতদিন আমিও দেখেছি
আকাশের দিকের উল্কাপতন
আলোর মরণ দেখেছি কখনও ভেতরের বস্তু
ধূলিকণা ছাই উড়ে গেছে ধোঁয়ার মতন!

রাত্রি সে আরাধ্যকাল ফিরে ফিরে আসে
পুষ্পে ঘাসে বীজে সিঞ্চিত হয় শৌর্য সকাল
দিনমান তামাশার বেচা-কেনা শেষে আমাদের
এ কেমন আয়ুর প্রান্ত; কৃশ আঙুল মরা ডাল!

আমরা তবু সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি পেতে রাখি
তরল আগুন বুকের কোথাও রয়েছে লুকানো আঁকও
ব্যবহৃত তেজসের থেকে গজালো কি উজ্জ্বল নবীন নখ?
উর্ধ্ব হতে মহুয়া বনের দিকে এ কোন সভ্য সাঁকো!

জীবনের জন্যই কি তবে দু'হাত বাড়িয়েছিলাম
ভারী ডানার পাখি উড়ে ওঠে; হৃৎপিণ্ডে জাগে কাঁপন
রোপিত ফসল ঘরে তোলা হলে নিশ্চিন্ত দেহ-মন
অন্যজীবন; থাকলে সুযোগ খুঁজে নেব হে আপন!

আমাদের বৈশাখ
আলমগীর কবির

আমাদের বৈশাখ সব রঙে রাঙানো
বন্ধুর সাথে মান-অভিমান ভাঙানো!
আমাদের বৈশাখ ফুলে ফুলে সাজানো
মেলা থেকে বাঁশি কিনে সুরে সুরে বাজানো।

আমাদের বৈশাখ লাল-নীল ঘুড়িতে
দলবেধে ছুটোছুটি স্বপ্নপুরিতে!
আমাদের বৈশাখ মিলেমিশে থাকাতে,
ভালোবাসা সম্প্রীতি বুকে পুষে রাখাতে।

লাঠিখেলা হাঁড়িভাঙা গ্রামীণ মেলাতে
দলবেঁধে মেতে থাকা মার্বেল খেলাতে।
উঠোনের জলসায় রূপকথা শোনাতে,
হইচই লুটোপুটি কী দস্যিপনাতে!

রবিন বসনালয়

জসীম আল ফাহিম

চৈত্রের শেষ প্রহর। প্রকৃতির বুকজুড়ে যেন নতুনের শুভবার্তা ভেসে বেড়াচ্ছে। বসন্তের রঙিন সাজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। শিমুল আর পলাশের লাল পাপড়ি অনেক আগেই ঝরে পড়েছে ধুলোমাখা পথের ধারে। গাছের ডালে ডালে নতুন পাতার কচি সবুজ আভা। বাতাসে গরমের হালকা ছোঁয়া। তবু তার মধ্যেও যেন আছে এক অদ্ভুত সজীবতা। গ্রীষ্ম যেন তার উজ্জ্বল উপস্থিতি নিয়ে চারদিকে নতুন জীবনের আহ্বান জানাচ্ছে।

গ্রামের পথের ধারে ধারে সোনালু আর কৃষ্ণচূড়া ফুলে ভরে উঠেছে। হলুদ আর লাল রঙের সেই মেলবন্ধনে মনে হয় যেন প্রকৃতি নিজেই নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আয়োজন করছে। পুরানো বছরের ক্লান্তি, হতাশা আর দুঃখ যেন ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে এই রঙিন সময়ের ভেতর দিয়ে। মানুষের মনেও তাই নতুন স্বপ্ন, নতুন আশার আলো জ্বলজ্বল করছে।

এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন রবিন ঘোষ। বাজারের এক কোণে তার ছোট্ট কাপড়ের দোকান। 'রবিন বসনালয়'। বহু বছর ধরে তিনি এই দোকান চালিয়ে আসছেন। পহেলা বৈশাখকে ঘিরে প্রতিবছরই তার দোকানে হালখাতার আয়োজন করা হয়। গ্রামের মানুষজনের কাছে এটি শুধু একটি ব্যাবসায়িক অনুষ্ঠান নয়। বরং একধরনের উৎসবও বটে।

বছরের প্রথম দিনটিকে ঘিরে রবিন ঘোষের মনে নতুন আশার আলো জ্বলে ওঠে। গত বছরের বকেয়া পাওনা আদায় হবে। নতুন হিসাবের খাতা খুলবেন। ব্যাবসা আবার নতুন করে শুরু হবে– এই আশাতেই তিনি বুক বাধেন।

হালখাতা উপলক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু আয়োজন করেছেন। রঙিন খামে মোড়ানো দাওয়াতপত্র ইতোমধ্যে তার পুরানো ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে গেছে। প্রতিটি খামের ওপর লাল কালি দিয়ে লেখা– পহেলা বৈশাখে হালখাতার নিমন্ত্রণ।

গ্রামের মানুষ এমন নিমন্ত্রণ পেলে খুব খুশি হয়। তারা জানে, সেদিন দোকানে গেলে মিষ্টিমুখ করানো হবে। গল্পগুজব হবে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় হবে।

এ জন্যই রবিন ঘোষ বাজারের বিখ্যাত মিষ্টির দোকান

মরণচাঁদের কাছ থেকে দশ কেজি রসগোল্লার অর্ডার দিয়েছেন। মরণচাঁদও খুশি হয়ে বলেছিল, রবিনদা, চিন্তা করবেন না। একদম টাটকা রসগোল্লা বানাবো। আপনার হালখাতা যেন জমজমাট হয়!

রবিন ঘোষ হাসিমুখে বলেছিলেন, তোমার মিষ্টি থাকলে আর চিন্তা কী!

পহেলা বৈশাখের দিন দলে দলে ক্রেতারা আসবেন– এই কল্পনায় প্রায়ই বিভোর হয়ে থাকেন তিনি। কেউ বকেয়া টাকা পরিশোধ করবে, কেউ নতুন কাপড় কিনবে। দোকান ভরে যাবে মানুষের কোলাহলে।

রবিন ঘোষ একজন সৎ ও পরিশ্রমী কাপড় ব্যবসায়ী। তার দোকানে সুতির শাড়ি, লুঙ্গি, থ্রি-পিস, গামছা– সবই পাওয়া যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষই তার প্রধান ক্রেতা। লাভ খুব বেশি না হলেও সৎভাবে তিনি ব্যাবসা চালিয়ে আসছেন বহু বছর ধরে।

তার সংসারে লোকবল কম। মা-বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় তাদের মৃত্যুর পর তিনি প্রায় একাই সব দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। স্ত্রীও অনেক আগে অসুখে মারা গেছেন। তাই সন্তান দুটিকে তিনি নিজ হাতেই মানুষ করছেন।

তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম নিতাই ঘোষ। আর মেয়েটির নাম মিতা ঘোষ। নিতাই এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দেবে। ছেলেটি পড়াশোনায় বেশ ভালো। তার স্বপ্ন বড়ো হয়ে ডাক্তার হওয়া। আর মিতা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে খুব কৌতূহলী স্বভাবের মেয়ে। ছোটো ছোটো জিনিস খুলে আবার জোড়া লাগাতে ভালোবাসে। তাই সে বলে– বাবা, আমি বড়ো হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হব।

সন্তানদের এই স্বপ্ন শুনে রবিন ঘোষের চোখে আনন্দের জল নামে। তিনি মনে মনে ভাবেন, আমি হয়ত বড়ো কিছু করতে পারিনি কিন্তু আমার সন্তানেরা যেন পারে।

এই স্বপ্ন পূরণ করতেই তিনি দিনরাত পরিশ্রম করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দোকানে বসে থাকেন। মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে গেলেও তিনি থামেন না।

পহেলা বৈশাখের আগের দিন বাজারে বেশ কোলাহল তৈরি হলো। সবাই নতুন কাপড় কিনছে। দোকানে ক্রেতার ভিড়ও বেড়েছে। রবিন ঘোষ ব্যস্ত হাতে কাপড় মেপে দিচ্ছেন, টাকা নিচ্ছেন, হিসাব লিখছেন।

সেই দিন বিকালে নিতাই দোকানে এসে বলল, বাবা, আজ স্কুলে স্যার বলছিলেন, নতুন বছর মানে নতুনভাবে শুরু করা। মানুষ যদি চেষ্টা করে তাহলে সবকিছুই আবার নতুন করে গড়া যায়।

রবিন ঘোষ হেসে বললেন, ঠিক কথাই বলেছে তোমার স্যার। জীবনের বেলায়ও ঠিক তাই।

মিতা সে সময় দোকানের এক কোণে বসে রঙিন কাগজ দিয়ে ছোটো ছোটো ফুল বানাচ্ছিল। সে বলল, এই ফুলগুলো দোকানে ঝুলিয়ে দেব। তাহলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে।

রবিন ঘোষ মুগ্ধ হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, তোমরা থাকলে আমার দোকানটা যেন ঘরবাড়ির মতোই মনে হয়।

রাত হয়ে গেলেও কাজ শেষ হলো না। তাই তিনি ঠিক করলেন রাতেই দোকান সাজানোর কাজ শেষ করবেন। রাত তখন প্রায় এগারোটা। দোকানের সামনে রঙিন কাগজ, ফেস্টুন আর ফুলের মালা এনে রাখা হয়েছে। নিতাইও বাবাকে সাহায্য করতে এসেছে। সঙ্গে আরও দুজন শ্রমিক। রঙিন কাগজ কেটে সুতোয় গেঁথে দোকানের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কেউ তাক পরিষ্কার করছে, কেউ নতুন খাতা সাজিয়ে রাখছে।

রাত তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। পুরো বাজার অন্ধকারে ডুবে গেল। চারদিকে নিস্তব্ধতা। দূরে কোথাও কুকুরের ডাক শোনা গেল। তখন নিতাই একটি মোমবাতি জ্বালালো। ছোট্ট সেই আলোতেই আবার সাজসজ্জার কাজ চলতে লাগল। মোমবাতিটি রাখা হয়েছিল কাপড়ের তাকের কাছে একটি স্ট্যান্ডের ওপর। আলোটা ছোটো হলেও কাজ চালানোর মতো ছিল। লোডশেডিং দীর্ঘ হতে লাগল। মোমবাতি জ্বলতে জ্বলতে ছোটো হয়ে এলো। কখন যে প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তা কেউ খেয়ালই করেনি। এর মধ্যে

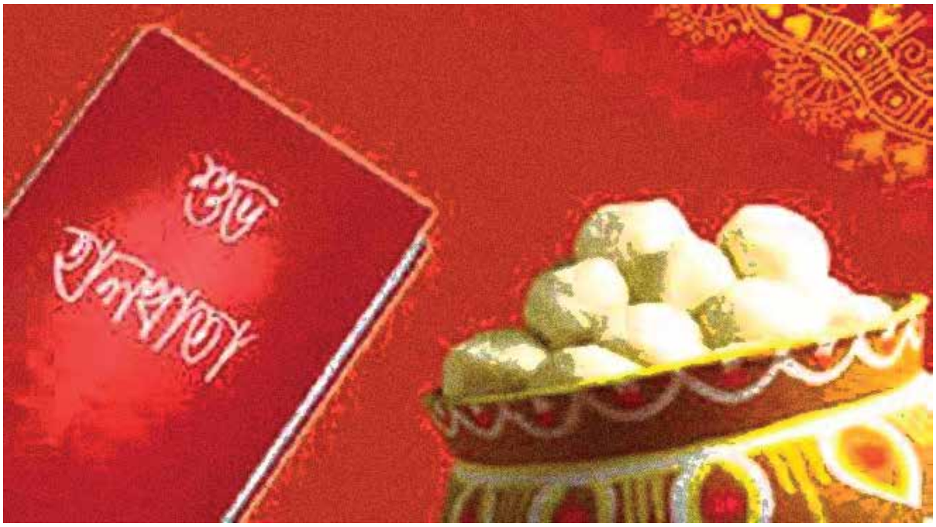

দুবার নতুন মোমবাতিও বসানো হয়েছিল। সবাই এতটাই কাজে ব্যস্ত ছিল যে চারপাশের দিকে নজর দেওয়ার সময়ও পায়নি।

রাত প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে কাজ শেষ হলো। দোকানটি এখন উৎসবের মতো সাজানো। দরজার ওপর বড়ো করে লেখা– 'শুভ নববর্ষ।'

রবিন ঘোষ সন্তুষ্টচিত্তে দোকানটির দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, নিতাই, চল বাবা, এখন বাড়ি যাই। সকালে আবার আসতে হবে।

নিতাইও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পিতা-পুত্র বাড়ি ফিরে গেলেন। দোকানে থেকে গেল শ্রমিক দুজন। সারা রাতেও বিদ্যুৎ আর এলো না। অন্ধকার রাত। মশার গুনগুন শব্দে চারপাশ ভরে গেছে। মশার কামড় থেকে বাঁচতে শ্রমিক দুজন একটি কয়েল জ্বালিয়ে দিলো। তারপর ক্লান্ত শরীরে তারা মেঝেতে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম খেলাটা তখনো কেউ বুঝতে পারেনি। ঘুমের ঘোরে কখন যে কার পা লেগে কয়েলের স্ট্যান্ডটি উলটে যায়, তা তাদের কেউ টেরই পেল না। উলটে গিয়ে সেই জ্বলন্ত কয়েল ধীরে ধীরে কাপড়ের তাকের গায়ে ছুঁয়ে যায়। প্রথমে একটু ধোঁয়া ওঠে। তারপর কাপড়ের কোণে ছোট্ট আগুন জ্বলে ওঠে। কিছুক্ষণ পর সেই আগুন বড়ো হতে থাকে। শুকনো কাপড় তো খুব সহজেই আগুন ধরে গেল। ধীরে ধীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ল এক তাক থেকে আরেক তাকে। শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ল পুরো দোকানে। কাপড়ের স্তূপে আগুন লেগে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

শ্রমিক দুজন ঘুম ভেঙে উঠে আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল– 'আগুন! আগুন!'

কিন্তু ততক্ষণে আগুন এতটাই ছড়িয়ে গেছে যে কিছুই করার নেই। বাজারের মানুষ দৌড়ে আসে। কেউ বালতি দিয়ে পানি ঢালে। কেউ মাটি ছুড়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আগুন যেন আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

ভোরের দিকে খবর পেয়ে ছুটে আসেন রবিন ঘোষ। দোকানের সামনে এসে তিনি যেন পাথর হয়ে গেলেন। তার প্রিয় দোকানটি দাউদাউ করে জ্বলছে। রঙিন সাজ, নতুন খাতা, নতুন কাপড়– সব আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। তিনি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন, দেখলেন। চোখের সামনে তার বহু বছরের পরিশ্রম ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। নিতাই বাবার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলল, বাবা, এসব কী হয়ে গেল!

রবিন ঘোষ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তার চোখের কোণে জল জমা হলো।

ঘণ্টাখানেক পর আগুন ধীরে ধীরে নিভে এলো। কিন্তু তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

শুধু পোড়া কাঠ, ছাই আর ধোঁয়া। রবিন ঘোষ ধীরে ধীরে সেই ছাইয়ের স্তূপের পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। তার চোখ দিয়ে নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই আগুনে শুধু তার দোকানই পুড়েনি– পুড়ে গেছে তার নতুন বছরের স্বপ্ন। তার সন্তানের ভবিষ্যতের আশা।

চারদিক ঝলমল করে তখন নতুন বছরের সূর্য উঠছে। মানুষ আনন্দের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেউ নতুন কাপড় পরে বাজারে যাচ্ছে। কেউ পান্তা-ইলিশের কথা বলছে। কেউ আবার মেলায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু সেই আনন্দের ভিড়ে রবিন ঘোষ যেন নিঃস্ব হয়ে গেলেন।

ঠিক তখনই আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল। গ্রামের কয়েকজন মানুষ এগিয়ে এলেন। প্রথমে এলেন মরণচাঁদ মিষ্টিওয়ালা। তিনি এসে বললেন, রবিন দা! আপনার জন্য যে-রসগোল্লা বানিয়েছিলাম সেগুলো আমি বাজারে বিলিয়ে দেবো। আজকে সবাই আপনার পাশে দাঁড়াবে।

তারপর এলেন স্কুলের মাস্টার মশাই। তিনি বললেন, রবিন ঘোষ মন খারাপ করবেন না। আমরা সবাই মিলে আবার দোকানটা গড়ে তুলব।

ধীরে ধীরে আরও মানুষ জড়ো হতে লাগল।
কেউ বলল, আমি কিছু কাঠ দেবো।
কেউ বলল, আমি শ্রম দেবো।
কেউ আবার বলল, নতুন কাপড় এনে দেবো।
নিতাই বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকালো।

মিতা বাবার হাত ধরে বলল, বাবা, দেখো সবাই তোমাকে কেমন সাহায্য করতে এসেছেন।

রবিন ঘোষ ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। তার চোখে তখনো অশ্রু। কিন্তু সেই অশ্রুর ভেতরই যেন এক নতুন আশার আলো জ্বলে উঠেছে। তিনি বুঝলেন, মানুষের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ শুধু টাকা নয়, মানুষের ভালোবাসা।

সেদিন বিকালেই বাজারের মানুষ মিলে পোড়া দোকানের জায়গা পরিষ্কার করতে শুরু করল। নিতাই ও মিতা দুজনই সবার সঙ্গে কাজ করছিল। রবিন ঘোষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। তার মনে হলো, এই আগুন হয়ত তার দোকান পুড়িয়েছে, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের আলোকে নিভিয়ে দিতে পারেনি।

সন্ধ্যার আকাশে তখন রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। রবিন ঘোষ আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, নতুন বছর সত্যিই নতুন সম্ভাবনা, নতুন সূচনা নিয়ে আসে। ছাইয়ের ভেতর থেকেও কখনো কখনো জীবনের সবচেয়ে সুন্দর আশার অঙ্কুর জন্ম নেয়। আর সেই আশাই মানুষকে আবার উঠে দাঁড়াতে শেখায়।

চলে গেলেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা রহমান

সাইমন ইসলাম

দেশের সংগীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা রহমান মারা গেছেন । ২৬শে মার্চ রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতায় অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

মাহবুবা রহমানের জন্ম নাম মাহবুবা হাসনাত। তিনি ১৯৩৫ সালের ৩রা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে গান গাওয়া শুরু করেন তিনি। শম্ভু পালের কাছে দীক্ষাও নেন। চট্টগ্রামের আর্ট সংগীত সমিতিতে বেশ কয়েক বছর গান শেখেন তিনি। তখনকার দিনগুলোতে সংগীত অনুষ্ঠানগুলো ঘরোয়া আসর মুখর করে রাখত। তাই অল্প বয়স থেকেই তিনি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ নিয়ে গান করতেন। গিরিন চক্রবর্তী, সুরেন চক্রবর্তী, সুধীরলাল চক্রবর্তীর মতো গুণী শিল্পীদের কাছে তাঁর গান শেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

মাহবুবা রহমান পঞ্চাশ ও সত্তরের দশকের রেডিও ও চলচ্চিত্রের কালজয়ী গানের শিল্পীদের অন্যতম। তিনি মূলত পল্লিগীতি ও আধুনিক গানের শিল্পী। ১৯৪৭ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রথম তাঁর গান প্রচারিত হয়। দেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ*-এ সমর দাসের সুরে মাহবুবা রহমান গেয়েছিলেন 'মনের বনে দোলা লাগে' গানটি। এরপর শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের সুরে ফতেহ লোহানীর *আসিয়া* ছবির 'আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে' গানে কণ্ঠ দেন। এরপর তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত *জাগো হুয়া সাভেরা* ছবিতে সরোদবাদক তিমিরণের সুরে এবং কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের লেখা 'মোতি হো কে সিসা হো, জো টুট গ্যায়া' গানটি করেন। মাহবুবা রহমান নিজের সংগীতগুরু মমতাজ আলী খানের সুরে অনেকগুলো গান করেন। দ্বৈত কণ্ঠে গাওয়া এসব গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–'বৈদেশি নাগর', 'যাইও না যাইও না বৈদেশে যাইও না', *সাত ভাই চম্পা* ছবির 'আগুন জ্বালাইস না আমার গায়' প্রভৃতি।

স্বামী খান আতাউর রহমানের সঙ্গে প্রথম রেডিওতে মাহবুবা রহমান গেয়েছেন 'আমার থাকত যদি পাখির মতো ডানা' গানটি। ১৯৬১ সালে জহির রায়হানের কখনো আসেনি ছবিতে খান আতাউর রহমানের সুরে দুটি গান করেন– 'নিরালা রাতের প্রথম প্রহরে' ও 'তোমাকে ভালোবেসে অবশেষে কী পেলাম'। ১৯৬৮ সালে করাচির হিজ মাস্টার ভয়েস থেকে খান আতাউর রহমানের সুরে এই শিল্পীর কিছু গান রেকর্ড করা হয়। এর মধ্যে–'আমার যদি থাকত পাখির ডানা', 'আমার নাবলা কথা', 'সোনালি এই ধানের খেতে', 'আগে জানি না রে দয়াল', 'তুমি দাও দেখা দরদি', 'আমার বন্ধু বিনোদিয়া', 'আজকে আমার মালঞ্চে ফুল ফোটে নাই', 'আমার মন ভালো না গো প্রাণ ভালো না গো' গানগুলো উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এহতেশামের *এ দেশ তোমার আমার* ছবিতেও গান করেন মাহবুবা রহমান। পাশাপাশি *সোনার কাজল*, *যে নদী মরুপথে*, *রাজা সন্ন্যাসী*, *নবাব সিরাজউদ্দৌলা* ছবিতেও প্লেব্যাক করেন তিনি। মমতাজ আলী খানের সঙ্গে তাঁর গাওয়া–'যাইয়ো না যাইয়ো না বন্ধুরে' এবং 'ও বৈদেশি নাগর' গান দুটি এক সময় ছিল মানুষের মুখে মুখে।

সংগীতে অবদানের জন্য সরকার মাহবুবা রহমানকে ১৯৯৮ সালে একুশে পদক প্রদান করে। এছাড়া তিনি সমর দাস সংগীত পদক (২০০৪), ৫০-এর দশকের সেরা গায়কের জন্য গোল্ডেন জুবিলি ফিল্ম অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড (২০০৬)সহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। ব্যক্তিজীবনে তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে, যাদের মধ্যে রুমানা ইসলাম দেশের একজন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী। এই গুণী শিল্পীর মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ২৭শে মার্চ বাদ জুমা মগবাজার ওয়্যারলেস জামে মসজিদে তাঁর জানাজা হয়। এরপর মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

হাম (Measles): আপনার যা জানা প্রয়োজন

হাম একটি খুব সহজে ছড়ানো ভাইরাসজনিত রোগ, যা মূলত শিশুদের বেশি হয়। যেসব শিশু টিকা নেয়নি বা সম্পূর্ণ টিকা পায়নি, তাদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। হামের থেকে সুরক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ২ ডোজ সম্পূর্ণ টিকা গ্রহণ করা।

হামের লক্ষণ ও উপসর্গ:

- সারা শরীরে র‍্যাশ: প্রথমে মুখে শুরু হয়, পরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ৫-৬ দিন থাকে।
- উচ্চ জ্বর
- নাক দিয়ে পানি পড়া
- কাশি
- চোখ লাল হওয়া ও পানি পড়া
- মুখের ভিতরে ছোট সাদা দাগ

আপনার শিশুকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন:

- ৯ মাস ও ১৫ মাসে দেওয়া এমআর (হাম-রুবেলা) টিকার ২ ডোজ সম্পূর্ণ করুন।
- নিয়মিত সব টিকা সময়মতো দিন
- আসন্ন এমআর টিকাদান ক্যাম্পেইনে অংশ নিন
- সন্দেহভাজন (জ্বর ও র‍্যাশ থাকা) রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিন

কারও হাম হলে কী করবেন:

- দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নিন
- আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন
- শিশুকে আলাদা রাখুন (স্কুল, ভিড় বা খেলার জায়গায় যাওয়া বন্ধ রাখুন)

কোথায় সাহায্য বা তথ্য পাবেন:

- নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী (হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট)

© World Health Organization Bangladesh

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 10, April 2026, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd